ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

একটি মার্কসবাদী মূল্যায়ন

প্রভাস ঘোষ

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)

Bharatio Nabajagaraner Pathikrit Iswarchandra Vidyasagar Ekti Marxbadi Mulyayan — Provash Ghosh

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, একটি মার্কসবাদী মূল্যায়ন — প্রভাস ঘোষ

প্রথম প্রকাশ	ঃ	এপ্রিল, ২০১২
পরিমার্জিত দ্বিতীয় মুদ্রণ	ঃ	১০ মে, ২০১২
তৃতীয় মুদ্রণ	ঃ	২ জুন, ২০১২
চতুর্থ মুদ্রণ	ঃ	১০ অক্টোবর, ২০১২
পঞ্চম মুদ্রণ	ঃ	১ নভেম্বর, ২০১২
ষষ্ঠ মুদ্রণ	ঃ	১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৩
সপ্তম মুদ্রণ	ঃ	১৭ আগস্ট, ২০১৪
অষ্টম মুদ্রণ	ঃ	১ অক্টোবর, ২০১৫

প্রকাশক ঃ মানিক মুখার্জী
কেন্দ্রীয় কমিটি, এস ইউ সি আই (সি)
৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩
ফোন ঃ ২২৪৯-১৮২৮, ২২৬৫-৩২৩৪

লেজার কম্পোজিং ও মুদ্রণ ঃ
গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য ঃ **২০ টাকা**

প্রকাশকের কথা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১২০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে ২০১১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর এ আই ডি এস ও, এ আই ডি ওয়াই ও, এ আই এম এস এস, কমসোমল, পথিকৃৎ প্রভৃতি সংগঠনের উদ্যোগে কলকাতার মহাজাতি সদনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় বক্তা ছিলেন আমাদের দল এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ।

কমরেড প্রভাস ঘোষ তাঁর ভাষণে বিভিন্ন বিষয়ে বিদ্যাসাগরের বক্তব্য ও তাঁর জীবনের যে সব ঘটনা উল্লেখ করেছেন তা নেওয়া হয়েছে শ্রী ইন্দ্র মিত্র রচিত 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' গ্রন্থ থেকে।

কমরেড প্রভাস ঘোষের এই ভাষণটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০১২ সালের ২৪ এপ্রিল। তারপর পরিমার্জিত দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ মুদ্রণও নিঃশেষিত হয়েছে। এখন পুস্তিকাটির অষ্টম মুদ্রণ প্রকাশ করা হল।

১ অক্টোবর, ২০১৫
৪৮, লেনিন সরণী
কলকাতা ৭০০০১৩

মানিক মুখার্জী
কেন্দ্রীয় কমিটি
এস ইউ সি আই (সি)

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
একটি মার্কসবাদী মূল্যায়ন

ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় চরিত্র এবং বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। আপনারা জানেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ এবং স্বদেশি আন্দোলনের যুগ থেকে এখন পর্যন্ত সকলেই এই মহান মনীষীর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা অবনত করেছেন ও করেন। আপনারা এটাও জানেন যে, তিনি ইতিপূর্বে বহুজনের দ্বারা নানা বিশেষণে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধায় দীর্ঘদিন ধরে আমাদের দেশে যেসব ধারণা প্রচলিত আছে, তা হচ্ছে, তিনি বিদ্যার সাগর, দয়ার সাগর, করুণার সাগর, সমাজসংস্কারক, শিক্ষাসংস্কারক, বিধবাবিবাহ প্রবর্তক ইত্যাদি। অনেকটা এইভাবেই দীর্ঘদিন ধরে তিনি এ দেশের মানুষের কাছে পরিচিত হয়ে আছেন। কিন্তু, এগুলিই কি শুধু তাঁর যথার্থ পরিচয় বহন করে? এই পরিচয়গুলিই কি তাঁর মতো অনন্য সাধারণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যথেষ্ট?

বিদ্যাসাগর মূল্যায়নে মাইকেল মধুসূদন, রামেন্দ্রসুন্দর ও রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক উক্তি স্মরণীয়

তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য ব্যক্তিত্বরা তাঁর প্রতি কী গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন, আপনারা অনেকেই তা জানেন, আবার হয়তো কেউ কেউ নাও জানতে পারেন। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তাঁদের উপলব্ধিগুলিও স্মরণযোগ্য। প্রখ্যাত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, 'প্রাচীন ঋষির ন্যায় প্রতিভা ও প্রজ্ঞা, একজন ইংরেজের মতো কর্মশক্তি, আর হৃদয় হচ্ছে বাঙালি মায়ের অনুরূপ।'[১] বিদ্যাসাগর সম্পর্কে মধুসূদন দত্তের আরেকটি বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে, 'এদেশে প্রথম আধুনিক মানুষ'। কিন্তু বিদ্যাসাগরের এই বিপুল জ্ঞান,

কর্মোদ্দীপনা, আধুনিকতা ও হৃদয়বৃত্তির উৎস কোথায়? বাংলার পল্লীগ্রামের একটি গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হয়ে এদেশে প্রথম ইংলিশ ম্যান-এর মতো তাঁর এই এনার্জির উৎস কোথায়? দেশের অগণিত মানুষের প্রতি তাঁর এই দরদবোধের উৎস কোথায়? এ সবের উত্তর আমাদের খুঁজতে হবে।

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে সেই যুগের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন, "বস্তুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা যে তাঁহার নাম গ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।" (১) তিনি আরও বলেছেন, "অণুবীক্ষণ নামে একরকম যন্ত্র আছে; তাহাতে ছোট জিনিসকে বড় করিয়া দেখায়; বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থবিদ্যাশাস্ত্রে নির্দিষ্ট থাকিলেও ঐ উদ্দেশ্যে নির্মিত যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন।"(২) বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কী গভীর উপলব্ধি ও শ্রদ্ধা থেকে তিনি এই কথা বলেছেন, বোঝা যায়। প্রশ্ন হচ্ছে, বিদ্যাসাগরের এই বড়ত্বের উৎস কোথায়, যে বড়ত্বের সামনে অন্য পরিচিত বড়রা অতি ছোট হয়ে যান? সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ এবং অত্যন্ত মূল্যবান উক্তি তাঁর সম্পর্কে করেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেছিলেন, "আমাদের দেশের লোকেরা একদিক দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না করে থাকতে পারেন নি বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর চরিত্রের যে মহত্ত্বগুণে দেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ করতে পেরেছিলেন সেটাকে কেবলমাত্র তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্যের খ্যাতির দ্বারা তাঁরা ঢেকে রাখতে চান। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের যেটি সকলের চেয়ে বড়ো পরিচয় সেইটি তাঁর দেশবাসীরা তিরস্করণীর দ্বারা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন"।(৩) তিনি বলেছেন, "দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব।"(৪) রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য যথার্থ ও ঐতিহাসিক।

কিন্তু বিদ্যাসাগরের এই চারিত্রিক মহত্ত্ব, অজেয় পৌরুষ ও অক্ষয় মনুষ্যত্বের উৎস কোথায়, এই প্রশ্নটাও থেকে যায়। পরবর্তীকালে তাঁর সম্পর্কে অন্যান্য যাঁরা বলেছেন, অনেকটা একই রকম বক্তব্য তাঁরাও বিভিন্ন দিক থেকে বলেছেন। আরও পরে একদল তথাকথিত মার্কসবাদী পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের মধ্যে নিছক একজন 'সমাজ-সংস্কারক', 'শিক্ষা-সংস্কারক'-এর বেশি কিছু দেখতে পাননি।। আবার এইসব তথাকথিত মার্কসবাদী পণ্ডিতরা এদেশে নবজাগরণ হয়েছে কি হয়নি, এই বিতর্ক তুলে বিদ্যাসাগরকে নবজাগরণের চরিত্র বলা যায় কিনা, এই

প্রশ্নও তুলেছেন। তাঁর 'শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা ও পেটিবুর্জোয়া দোদুল্যমানতা আছে' — এইসব কথাও বলেছেন।

তাঁর প্রেরণার উৎস কী ছিল

এসব বিষয়ে আলোচনার আগে আমাদের দেখতে হবে এই মহান চরিত্রের, তাঁর অনন্য সাধারণ কঠোর ও কঠিন সংগ্রামের প্রেরণার উৎস কোথায় ছিল? এর উত্তর বিদ্যাসাগরেরই দু'টি ঐতিহাসিক উক্তিতে পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, "দরিদ্রের দুঃখ কয়জন দেখিয়াছে, তাঁহাদের হৃদয়ের ব্যথা কয়জন বুঝিয়াছে।"† আর বলেছেন, "যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশের হিতসাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া তাহার পরম ধর্ম ও তাহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ম।"† এই দু'টি অসাধারণ গভীর উপলব্ধিই ছিল বিদ্যাসাগরের জীবনের মূলমন্ত্র এবং সত্যানুসন্ধান ও কর্মসাধনার উৎস।

ইতিহাসে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে যত বড় মানুষ, মহান সংগ্রামের যত পথপ্রদর্শকের অভ্যুত্থান ঘটেছিল, তাঁরা সকলেই কিন্তু সেই যুগের নিপীড়িত-অত্যাচারিত গরিব মানুষের দুঃখ-ব্যথাকে বুকে বহন করেই মুক্তিসংগ্রামেরপথ প্রদর্শন করেছিলেন, বিশেষ যুগের বিশেষ প্রয়োজনের আহ্বানে। এই কথাই পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের মতো বড় মানুষদের সার্থক উত্তরসাধক সর্বহারা মুক্তি আন্দোলনের মহান পথপ্রদর্শক, আমার শিক্ষক, এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ একটি ছোট্ট কথায় ব্যক্ত করে বলেছিলেন, "বিপ্লবী রাজনীতি উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি।" শোষিত নির্যাতিত মানুষের প্রতি এই উচ্চতর হৃদয়বৃত্তিই এই সংগ্রামে বড় মানুষদের নিয়ে আসে। তাই দেখা যায়, বিদ্যাসাগরের সময়ে একদল শিক্ষা-দীক্ষা অর্জন করে অর্থ-বিত্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তি, নাম-ধাম ও ভোগবিলাসে মত্ত থেকেছে। আর বিদ্যাসাগর ছিলেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি নিজে যেমন খুবই কঠোর দারিদ্রের সাথে সংগ্রাম করে এগিয়েছিলেন, আবার খ্যাতি প্রতিষ্ঠার শীর্ষস্থানে বসেও কোনদিনই গরিবের ব্যথা ভোলেননি। বরং তারাই ছিল তাঁর পরম আপনজন। তাই সমাজের তথাকথিত বড়লোকদের আচরণে দুঃখ পেয়ে গভীর ক্ষোভে তিনি বলেছিলেন, "দরিদ্রের দুঃখ কয়জন দেখিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ের ব্যথা কয়জন বুঝিয়াছে।" আরেকটি মূল্যবান আদর্শ সারা জীবন শুধু নিজের জীবনে অনুসরণ করেছেন তাই নয়, দেশ-কাল নির্বিশেষে সকল মানুষেরই অনুসরণীয় হিসাবে নির্দেশ করে বলেছেন যে, জীবনের সর্বপ্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম হচ্ছে নিছক নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পূরণ নয়, নিজ দেশের হিতসাধনে অর্থাৎ নিজ দেশের জনগণের কল্যাণসাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া। এই দুটিই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র, তাঁর সংগ্রামবহুল সমগ্র জীবনে কর্মসাধনার প্রেরণার উৎস।

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে শিবদাস ঘোষের অনন্য মূল্যায়ন

কিন্তু মনে রাখবেন, শুধু দরিদ্রের প্রতি দরদবোধ ও দেশের হিতসাধনের আকাঙ্ক্ষার শক্তিতেই সঠিক সংগ্রাম চলে না, যদি সত্যানুসন্ধানের পথে সংগ্রামের পথনির্দেশক সঠিক আদর্শ না পাওয়া যায়। হৃদয়বৃত্তি, সততা, নিষ্ঠা, ত্যাগ ইত্যাদি মহৎ গুণ থাকলেও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, আদর্শ ও পথ না পেলে সংগ্রাম শুধু ব্যর্থ হয় তাই নয়, আকাঙ্ক্ষিত কল্যাণের পরিবর্তে তা অকল্যাণই ডেকে আনে। আমাদের দেশে ও বাইরে বেশ কয়েকজন বড় মানুষের ক্ষেত্রে এই ট্র্যাজেডিই ঘটেছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। এটা সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে, প্রবল সত্যানুসন্ধানী মনের অধিকারী হওয়ার ফলে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ও ধর্মীয় শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করে সেইযুগে ভারতে তিনিই প্রথম বলিষ্ঠ মানুষ যিনি অধ্যাত্মবাদ ও ধর্মীয় তমসাচ্ছন্ন চিন্তার শৃঙ্খল ছিন্ন করে সেক্যুলার মানবতাবাদের বার্তা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করতে পেরেছিলেন।

তাই বিদ্যাসাগরের মূল্যায়ন করে মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, "রাজা রামমোহন রায় থেকেই এদেশের রেনেসাঁস আন্দোলনের শুরু বলা চলে। ইউরোপের বুর্জোয়া মানবতাবাদী ধ্যানধারণা ও চিন্তাভাবনাগুলিকে ধর্মের মূল সুরটির সঙ্গে মিলিয়ে ধর্মীয় সংস্কারের পথেই তিনি এদেশে রেনেসাঁস আন্দোলনের জন্ম দেন। ফলে, এদেশের রেনেসাঁস আন্দোলন 'রিলিজিয়াস রিফর্মেশন'-এর (ধর্মীয় সংস্কারের) পথ ধরে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের অভ্যুত্থান রেনেসাঁস আন্দোলনে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা এবং যতদূর মনে হয় বিদ্যাসাগর মশাই-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি ধর্মীয় সংস্কারের পথে রেনেসাঁস আন্দোলনের মধ্যে একটা ব্রেক ঘটালেন। তিনিই প্রথম এদেশে যতদূর সম্ভব মানবতাবাদী আন্দোলনকে ইতিহাস, বিজ্ঞান ও যুক্তির শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে চাইলেন। ...বিদ্যাসাগরকে এদেশের মানুষ বড় মানুষ বলে জানেন, শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু তাঁকে বুঝেছেন কয়জন? আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ বিদ্যাসাগর মশাইয়ের হাঁটুর উপর কাপড় পরা, মাথায় টিকি রাখা দেখে তাঁকে একজন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ বলেই ভাবেন। একথা ঠিক, বাইরে তাঁর শাস্ত্রকারের মতো এবং নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের মতো বেশই ছিল। কিন্তু, ভিতরে তিনি ছিলেন তদানীন্তন ভারতীয় সমাজ পরিবেশে একজন খাঁটি 'হিউম্যানিস্ট'। তিনি ভারতীয় সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসভ্যতার একটি যুক্তিভিত্তিক সংযোগসাধন করতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর বক্তব্য ছিল, ছাত্রদের ইংরেজি শেখাও, 'মিল'-এর (জে এস মিল) লজিক পড়াও। সংস্কৃত শিখিয়ে কুব্জ হয়ে যাওয়া এই জাতির মেরুদণ্ড খাড়া করা যাবে না। ...এই

জাতির মেরুদণ্ড খাড়া করতে হলে বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে তাকে পরিচিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। আর, ইংরেজি শিখলে দেশের যুবকরা তার মাধ্যমে ইতিহাস, লজিক ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার সাথে পরিচিত হবে, ইউরোপের বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হবে। তাই তিনি ব্যালেন্টাইনের মতের বিরুদ্ধতা করে বলেছিলেন, আমাদের দেশের সাংখ্য ও বেদান্ত যেমন ভ্রান্ত দর্শন, তেমনি ইউরোপের বার্কলের দর্শনের মধ্য দিয়েও ঐ একই ভ্রান্ত ধারণা প্রতিফলিত। ...আমাদের দেশের মানুষকে এইসব ভ্রান্ত দর্শনের প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে; তবেই দেশের মানুষ বস্তুজগৎকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে সত্যোপলব্ধি করতে এবং তার উপরে মানুষের নতুন জীবনবোধ বা মূল্যবোধ খাড়া করতে সক্ষম হবে। তাই তিনি ঐসব অসার অধ্যাত্মবাদী ও ভাববাদী দর্শন ছাত্রদের পড়াবার ক্ষেত্রে বিরুদ্ধতা করেছিলেন।"[১] আমি মনে করি, ইতিপূর্বে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে এ ধরনের যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন এদেশে আর হয়নি। বোঝা যায়, দরিদ্র-নিপীড়িত মানুষের প্রতি প্রবল হৃদয়বৃত্তি, নিজ দেশের কল্যাণসাধনকে জীবনের প্রধান কর্ম বলে গণ্য করা এবং সত্যানুসন্ধানে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত হয়ে সেক্যুলার মানবতাবাদী হিসাবে বিজ্ঞান ও যুক্তিকে অনুসরণের পথেই বিদ্যাসাগর এতো বিরাট চরিত্রের অধিকারী হয়েছিলেন। শিবদাস ঘোষের ছাত্র হিসাবে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তাঁর ঐতিহাসিক মূল্যায়ন এবং মার্কসবাদী বিচারধারাকে ভিত্তি করে আজ আমি আমার ক্ষমতা অনুযায়ী এই মহৎ চরিত্র নিয়ে কিছু আলোচনা আপনাদের সামনে রাখব। আর, যেহেতু বিদ্যাসাগরের নানা দিক ও বক্তব্য সম্পর্কে অনেকে পরিচিত নন, তাই বিদ্যাসাগরের কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পড়েও শোনাব, যেগুলি আমি মনে করি, আপনাদের জানা দরকার।

কোনও চিন্তা ও চিন্তানায়কের অভ্যুত্থান কীভাবে ঘটে

মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে, একটা বিষয় পরিষ্কার করা দরকার বলে আমি মনে করি। প্রথমত, একটা প্রতিভা বা একজন মনীষীর যখন কোনও যুগে বা কোনও দেশে অভ্যুত্থান ঘটে, তা কি ঐশ্বরিক কারণে বা আকস্মিকভাবে ঘটে? এর কি কোনও কার্যকারণ সম্পর্ক নেই? মার্কসবাদের ছাত্র হিসাবে আমরা তা মনে করি না। বিজ্ঞান এবং ইতিহাসও তা বলে না। ইতিহাসে দেখা যায় যে, যেকোনও আদর্শ, যেকোনও চিন্তা, যেকোনও প্রতিভা, যেকোনও মনীষী বা যেকোনও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের অভ্যুত্থান কোনও বিশেষ সমাজ ও দেশের বিকাশের একটা স্তরে একটা সামাজিক প্রয়োজন, সামাজিক চাহিদা বা সামাজিক আকুতিকে ভিত্তি করেই ঘটে। যেমন বুদ্ধের যুগে বিদ্যাসাগরের অভ্যুত্থান সম্ভব

ছিল না, তেমনি বিদ্যাসাগরের যুগে বুদ্ধেরও অভ্যুত্থান সম্ভব নয়, যিশুখ্রিস্টের যুগে আইনস্টাইন বা আইনস্টাইনের যুগে যিশুখ্রিস্টের অভ্যুত্থান সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয়, এর উত্তরে মার্কসবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, যেকোনও চিন্তাভাবনা আসার আগে, যেকোনও চিন্তানায়কের অভ্যুত্থানের আগে, তার চিন্তার উপাদানগুলি সমাজ জীবনে আসে। বিশেষ যুগের বিশেষ বাস্তব পরিস্থিতিতে (মেটিরিয়াল কন্ডিশন) বা চলমান সামাজিক পরিস্থিতির এক বিশেষ স্তরে মানুষের মস্তিষ্কের সাথে পারিপার্শ্বিকের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে চিন্তা এবং চিন্তানায়কের অভ্যুত্থান ঘটে। সেই অর্থে বিদ্যাসাগরকেও তাঁর যুগের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বুঝতে হবে। দ্বিতীয়ত, আর একটা প্রাসঙ্গিক বিষয় এখানে বলা দরকার। সেটা হচ্ছে, বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে আমরা মার্কসবাদীরা জানি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই হচ্ছে যেকোনও সমাজের ভিত্তি (বেস), আর এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ভিত্তি করেই তার উপরিকাঠামো (সুপারস্ট্রাকচার) — অর্থাৎ আদর্শ, চিন্তা-ভাবনা, নীতি-নৈতিকতা, ধ্যান-ধারণা, রাজনীতি, সামাজিক সম্পর্ক ও সংগঠন ইত্যাদি গড়ে ওঠে। বাস্তবে এমন হয় না যে, একটা চিন্তা এসে গেল, আদর্শ এসে গেল, কিন্তু তা আসার জন্য অপরিহার্য পরিপূরক উপাদান বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভিত্তিতে আসে নি। কিন্তু আবার ব্যাপারটা এরকমও নয় যে, ভিত্তি হিসাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যতটা গড়ে উঠবে, উপরিকাঠামোতে ঠিক ততটাই আদর্শ, চিন্তা ও ধারণা গড়ে উঠবে, যেন চিন্তার বিকাশের কোনও আপেক্ষিক স্বাধীনতাও নেই। শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে চিন্তার জগৎ, ভাবের জগৎ এলেও এটা ইকনমিক ডিটারমিনিজম বা অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ নয়। অনেক সময় দেখা যায়, অর্থনৈতিক বিকাশ খুবই অনগ্রসর, কিন্তু চিন্তা এগিয়ে গেছে। আবার দেখা যায়, অর্থনৈতিক বিকাশ খুবই শক্তিশালী, কিন্তু সেই অনুযায়ী আদর্শগত নেতৃত্ব বা চিন্তাভাবনা তেমন শক্তিশালী রূপে আসেনি। আদর্শ এবং আদর্শগত নেতৃত্বেরও নিজস্ব একটা আন্দোলন থাকে, তার উপর তার শক্তিবৃদ্ধি হওয়া না-হওয়া নির্ভর করে। এটাও বোঝা দরকার। কিন্তু এমন কোনও চিন্তা ও চিন্তানায়ক আসতে পারে না যার আসার মতো উপাদান কম হোক, আর বেশিই হোক, অর্থনৈতিক ভিত্তিতে আসেনি। মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এটাও বুঝতে হবে, যেকোনও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই হচ্ছে 'বেসিক কজ' বা মূল কারণ, আর বহির্দ্বন্দ্ব হচ্ছে তার 'কন্ডিশন' বা পরিবেশ। যেকোনও বস্তু বা যেকোনও সমাজের যেমন আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব থাকে, তেমন বহির্দ্বন্দ্বও থাকে এবং উভয়ের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের দ্বারাই তার পরিবর্তন নির্ধারিত হয়। কিন্তু আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব 'ম্যাচিওর' করলেও বহির্দ্বন্দ্ব সহায়ক না হলে পরিবর্তন যথার্থ পরিণতিতে পৌঁছায়

না। আবার অনেক সময় আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব 'ম্যাচিওর' না করলেও বহির্দ্বন্দ্ব তাকে ত্বরান্বিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এ হল মার্কসবাদের বুনিয়াদি শিক্ষা। কেন এই আলোচনা করতে হচ্ছে?

ইউরোপীয় নবজাগরণের ভিত্তি শিল্পবিপ্লব ছিল না, বণিকী পুঁজির স্তরেই এর সূচনা হয়েছিল

কারণ, তথাকথিত মার্কসবাদীরা প্রশ্ন তুলেছেন, ভারতবর্ষে সেই সময় বুর্জোয়াশ্রেণী আসেনি, শিল্পবিপ্লব হয়নি, আর শিল্পবিপ্লবের প্রয়োজনেই তো নবজাগরণ, তাহলে কী করে বলা যায় যে, বিদ্যাসাগর ভারতীয় নবজাগরণের প্রতিনিধি ছিলেন? মার্কসবাদকে পাণ্ডিত্যের (স্কলাসটিসিজম) দিক থেকে বোঝার ফলেই তাঁদের এই অদ্ভুত বিচারধারা এসেছে। প্রথমত, একথা আদৌ ঠিক নয় যে, শিল্পবিপ্লবকে ভিত্তি করে নবজাগরণ এসেছে। ইতিহাসে দেখা যায়, শিল্পবিপ্লব আসার আগেই নবজাগরণের উন্মেষ ঘটেছে, নবজাগরণ শিল্পবিপ্লবের জমি প্রস্তুত করেছে। এটা আমাদের কথা নয়, মহান মার্কসের সুযোগ্য সহযোদ্ধা মহান এঙ্গেলস তাঁর ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'ডায়ালেকটিকস অফ নেচার' প্রবন্ধে ইউরোপে রেনেসাঁসের সূচনা সম্পর্কে বলছেন, "যে শক্তিশালী যুগটিকে আমরা জার্মানরা নাম দিয়েছি ... সংস্কার, ফ্রান্স যাকে বলে থাকে রেনেসাঁস, ইতালীয়রা বলে থাকে 'সিনকিউসেন্টো' ...এই যুগের উদ্ভব পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে। শহরের বণিকদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে রাজবংশীয় ব্যক্তিবর্গ ধ্বংস করল সামন্ত-অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্ষমতাকে এবং প্রতিষ্ঠা করল ন্যাশনালিটিভিত্তিক বড় বড় রাজতন্ত্র। যার অভ্যন্তরে আধুনিক ইউরোপীয় জাতিগুলির এবং আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ বিকশিত হয়েছে।[১] অর্থাৎ নবজাগরণের ক্ষেত্রে এখানে ভূমিকা পালন করেছে বণিকী পুঁজিভিত্তিক নগরের বার্গারস বা বণিকরা। ছোট ছোট ফিউডাল পাওয়ারকে ভেঙে ন্যাশনালিটিকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বড় বড় রাজতন্ত্রের আওতায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি এবং বুর্জোয়া সমাজ গড়ে উঠেছে। তাছাড়া পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপে শিল্পবিপ্লব হওয়ার মতো অবস্থা কি ছিল? তখন শিল্পবিপ্লব ছিল প্রায় মাতৃগর্ভে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ইউরোপে শিল্পপুঁজি নয়, মূলত বণিকী পুঁজির স্তরে পণ্য চলাচলের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠা নগরগুলির বণিকরাই রাজবংশীয় ব্যক্তিদের সাথে হাত মিলিয়ে সামন্ত অভিজাতদের ক্ষমতা খর্ব করে আধুনিক বুর্জোয়া জাতিগুলি এবং আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ আসার জমি তৈরি করার লগ্নেই নবজাগরণের সূচনা ঘটেছে। এরই পথ বেয়ে পরে শিল্পপুঁজির অভ্যুত্থান ঘটেছে। এই হচ্ছে মার্কসবাদের অথরিটি এঙ্গেলসের বক্তব্য। এই বার্গাররা কারা এবং এরাই যে পরবর্তীকালে

বুর্জোয়াদের জন্ম দিয়েছে সেই সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ইস্তাহারে বলেছেন, "একেবারে সূচনায় নগরগুলিতে বার্গারদের উদ্ভব ঘটেছিল মধ্যযুগের ভূমিদাসদের থেকে। এই বার্গারদের মধ্য থেকে বুর্জোয়াদের উপাদান বিকশিত হয়।"(২) অর্থাৎ তৎকালীন গড়ে ওঠা নগরগুলির বার্গাররাই পরবর্তীকালে শিল্পপুঁজির জন্ম দিয়েছে এবং বার্গাররাই নবজাগরণের সূচনা করেছে। বিকাশের স্তরে শিল্পপুঁজি এই নবজাগরণের ঝান্ডাকে আরও বলিষ্ঠভাবে বহন করে গেছে। ফলে যেসব মার্কসবাদরীরা বলছেন, শিল্পবিপ্লব না হলে রেঁনেসাস হতে পারে না, তারা মার্কস-এঙ্গেলসের বক্তব্যের বিরুদ্ধেই বলছেন।

অন্তর্দ্বন্দ্ব মূল কারণ হলেও বর্হিদ্বন্দ্বও কখনও কখনও পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়

আরেকটা বিষয়ও বলতে চাই; ইউরোপের ইতিহাসে আপনারা দেখবেন, মানবতাবাদী সাহিত্য, যেটা নবজাগরণের যুগের সাহিত্য — তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানির বিরাট অবদান ছিল। সেই সময় এই দেশগুলি শিল্পপুঁজির বিকাশের দিক থেকে উন্নত ছিল। আবার পাশাপাশি রুশ সাহিত্যেরও যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছিল। রাশিয়ায় সাহিত্যের সূচনায় পুশকিন, তারপর দস্তয়েভস্কি, গোগোল, তুর্গেনেভ, চেখভ, টলস্টয়রা বিরাট অবদান রেখে গেছেন। এঁদের সাহিত্য সাধনার সময় রাশিয়ায় পুঁজিবাদের অগ্রগতি সামান্যই ছিল বা রাশিয়ার অভ্যন্তরে তখনও শিল্পপুঁজি ভালো করে মাথাই তুলতে পারেনি। অথচ, বিশ্বের বিস্ময়কর মানবতাবাদী সাহিত্য সৃষ্টি করেছে রাশিয়া। এটা হচ্ছে এক্সটারন্যাল কন্ট্রাডিকশন বা বহির্দ্বন্দ্বের প্রভাব। ইউরোপে শিল্পবিপ্লবে অগ্রসর দেশগুলির প্রভাবেই অনুন্নত রাশিয়ায় এটা সম্ভব হয়েছিল। রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবটাই ভাবুন না কেন। রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় সেই দেশে পুঁজিবাদের অগ্রগতি কতটুকু হয়েছিল! শিল্প ও শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাগত অবস্থান কতটুকু ছিল! ইউরোপের বেশ কিছু দেশ তখন তার থেকে অনেক এগিয়ে ছিল, অথচ সেইসব দেশে নয়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়ে গেল শিল্পে খুবই অনুন্নত রাশিয়ায়। এটা সম্ভব হয়েছিল ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলোতে ইতিমধ্যেই যে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা গড়ে উঠেছিল তার প্রভাবে, সম্ভব হয়েছিল যিনি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ও রাশিয়ার তথাকথিত মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করে মার্কসবাদকে আরও উন্নত স্তরে উন্নীত করেছিলেন, যথার্থ মার্কসবাদী দল বলশেভিক পার্টি গড়ে তুলেছেন এবং প্রথম মহাযুদ্ধ উদ্ভূত রাশিয়ার বিশেষ পরিস্থিতিতে মার্কসবাদকে সফলভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন সেই মহান লেনিনের ঐতিহাসিক ভূমিকায়। ফলে যারা শুধু দেখে

আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব কতটা প্রস্তুত, তাদের বিচারধারা যান্ত্রিক এবং তারা বহির্দ্বন্দ্বকে গুরুত্বহীন মনে করে। একথা ঠিক যে, আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মধ্যে পরিবর্তনের উপাদান না দেখা দিলে শুধু বহির্দ্বন্দ্বই পরিবর্তন ঘটিয়ে দিতে পারে না। কিন্তু কখনও কখনও কিছু সুনির্দিষ্ট কারণে বহির্দ্বন্দ্ব আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে খুবই ত্বরান্বিত করে দেয়, ম্যাচিওর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। যেমন চীনে পুঁজিবাদ ও শ্রমিকশ্রেণী খুবই দুর্বল থাকা সত্ত্বেও একই কারণে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্রবিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সংগঠিত হল, যেটা বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে হওয়ার কথা ছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল অন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রভাব ও বিশেষত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক সাফল্যের ফলে।

বিদ্যাসাগরের সময় ব্রিটেন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির স্তরে আসেনি

এখন দেখা দরকার, বিদ্যাসাগরের যুগটা কী ছিল? ভারতবর্ষে তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, মানে ইংল্যান্ডের বণিকী পুঁজির শাসন চলছে। একটা সময় পর্যন্ত এদেশে ব্রিটিশ বণিকী পুঁজির শাসন ছিল, পরবর্তীকালে অর্থাৎ সিপাহি বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ শিল্পপুঁজির শাসন এসেছিল। Finance capital export-এর ভিত্তিতে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ বলতে আমরা যা বুঝি, বিদ্যাসাগরের সময়ে সেটা আসেনি। কারও কারও লেখায় ভুলবশত এরকম কিছু এক্সপ্রেশন আছে যে সে সময় যেন এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন চলছিল। এটা ঠিক নয়। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ কখন এল, সে সম্পর্কে লেনিন বলছেন, "উনিশ শতকের শেষ দিককার তেজি অবস্থা এবং ১৯০০ থেকে ১৯০৩ সালের সংকট। সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনের অন্যতম ভিত্তি হিসাবে কার্টেল ব্যবস্থা গড়ে উঠল। পুঁজিবাদ রূপান্তরিত হল সাম্রাজ্যবাদে।"[১] ফলে ইউরোপে ১৯০০ থেকে ১৯০৩ সালে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের সূচনা হয়েছে। বিদ্যাসাগর এই সাম্রাজ্যবাদী যুগই দেখেননি।

কোন্ পরিস্থিতিতে এ দেশে নবজাগরণের সূচনা হয়

ফলে প্রথমদিকে এদেশে ব্রিটিশ বণিকী পুঁজির শাসন ও পরবর্তীকালে শিল্পপুঁজির শাসন ছিল। আর বিদ্যাসাগরের সময়ে ভারতীয় বণিকী পুঁজিও ছিল। ব্রিটিশ বণিকী পুঁজি ভারতে আসার বহু দিন আগেই অন্যান্য দেশের মতো ভারতীয় বণিকী পুঁজির জন্ম হয়েছিল, ক্রমান্বয়ে তার যথেষ্ট বিস্তারও ঘটেছিল, বাইরেও বাণিজ্য চলত। সামন্ততান্ত্রিক শাসনের অধীনে থেকেই কালের গতিপথে সামন্ততন্ত্রের শক্তি যত হ্রাস পেতে থাকল, দেশীয় বণিকী পুঁজির প্রভাবও তত

বাড়তে থাকল। ইতিমধ্যে ইউরোপের বণিকরাও, বিশেষত ব্রিটিশ বণিকরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে এদেশে বাণিজ্য বিস্তার করতে থাকল। এই দুই দেশের বণিকী পুঁজির মধ্যে বাণিজ্যিক স্বার্থের সহযোগিতা ও সংঘাত দুই-ই ছিল। আবার দেশি-বিদেশি উভয়ের বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা বিধিনিষেধ আরোপ করে অন্তরায় সৃষ্টি করছিল। ফলে নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার পরাজয়ের ক্ষেত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ সহ এদেশের বণিকরা বাণিজ্যিক স্বার্থেই হাত মিলিয়ে ছিল। কিন্তু এরপর পরবর্তী নবাব মিরজাফরের শাসনকালে ব্রিটিশ বণিকী পুঁজিপতিরাই সুবিধা আদায় করেছিল ট্যাক্স ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারতীয় বণিকদের বঞ্চিত করে। সেজন্য মির জাফরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে মির কাসেমকে এদেশীয় বণিকী পুঁজি মদত দিয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তুলনায় বেশি সুবিধা পাওয়ার স্বার্থে। এদেশীয় বণিকরা মির কাশেমের শাসনকালে সেটা পাচ্ছিলও। কিন্তু শেষপর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মির কাশেমকে ক্ষমতাচ্যুত করে পুনরায় মির জাফরকে নবাবি গদিতে বসায় এবং দেশীয় বণিকী পুঁজিকে ধ্বংস করার পথ প্রশস্ত করে। এর ফলে দেশীয় বণিকী পুঁজিপতিদের অগ্রগতি যথেষ্ট ব্যাহত হয়, এবং ক্রমান্বয়ে তারা কম্প্রাডর বুর্জোয়ায় পর্যবসিত হয়। পরবর্তীকালে এই কম্প্রাডর পুঁজির একটি অংশ ক্ষুদ্র দেশীয় শিল্পপুঁজিতে পরিণত হয়। সিপাহি বিদ্রোহের কিছু পূর্বে বা সমসাময়িককালে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। অর্থাৎ সেই সময়ে এদেশে একদিকে বিদেশি বণিকী পুঁজির আধিপত্য যেমন ছিল, আবার তার তুলনায় অপেক্ষাকৃত হীনবল ও দমিত অবস্থায় থাকলেও দেশীয় বণিকী পুঁজিও সক্রিয় ছিল। যদিও কৃষিতে ইউরোপের নবজাগরণ পর্বের মতোই সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কই কাজ করছিল। অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসনকে ভিত্তি করে ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষার সূচনা হয়। এই অবস্থায় এই দেশে নতুন গড়ে ওঠা নগরগুলিতে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মুষ্টিমেয় এক দল মানুষের মধ্যে প্রথম ইউরোপীয় নবজাগরণের চিন্তার প্রভাব এল। সেই সময়ে ইউরোপে শিল্পপুঁজি যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছিল এবং নবজাগরণ ও মানবতাবাদের ঝান্ডাকে তখনও বহন করছিল। এই নবজাগরণের চিন্তাই এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একাংশের মননকে প্রভাবিত করেছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বুঝতে হবে বিদ্যাসাগরকে। মার্কসবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ বিদ্যাসাগর সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন, বিদ্যাসাগর ছিলেন ভারতবর্ষে সেক্যুলার মানবতাবাদের প্রথম প্রতিনিধি, নবজাগরণের বলিষ্ঠ প্রতিনিধি। তাঁর এই বিচার সম্পূর্ণ সঠিক এবং মার্কসবাদ সম্মত। একথা ঠিক, বিদ্যাসাগরের পূর্বে রাজা রামমোহনই প্রথম ইউরোপীয় মানবতাবাদের চিন্তা এদেশে নিয়ে এসেছিলেন এবং সংস্কৃত শিক্ষার

পরিবর্তে ইংরেজি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর এই ভূমিকা ঐতিহাসিক। কিন্তু তিনি অধ্যাত্মবাদের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেননি, তাই হিন্দু ধর্মকে সংস্কার করে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অনেকটা যেমন জার্মানিতে মার্টিন লুথার খ্রিস্টধর্মের ক্যাথলিক ধারার সংস্কার করে প্রোটেস্ট্যান্ট ধারা প্রবর্তন করেছিলেন। রামমোহনের অভ্যুত্থান এদেশের নবজাগরণের ইতিহাসে অনেকটা ঊষাকালের মতো — রাত্রির অন্ধকার অপসৃয়মান, তখনও সূর্যোদয় ঘটেনি, কিন্তু পূর্ব দিগন্তে তারই রক্তিম পূর্বাভাস। আর বিদ্যাসাগর হচ্ছেন কয়েক সহস্র বছরের অন্ধকার ভেদ করে প্রথম রক্তিম সূর্যোদয়।

বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ সেক্যুলার

বিদ্যাসাগরের যে দিকটা এদেশে খুব কম লোক জানেন এবং যেটা সবচেয়ে কম আলোচিত অথচ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে তাঁর অধ্যাত্মবাদমুক্ত মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। এই পার্থিব মানবতাবাদী চিন্তা, যেটা সেই যুগের সব থেকে উন্নত ও প্রগতিশীল চিন্তা, সেটাই ছিল তাঁর সমগ্র জীবনে সত্যের সাধনার হাতিয়ার। তাঁর সেই বলিষ্ঠ উক্তি, 'সাংখ্য-বেদান্ত মিথ্যা, এর মধ্যে কোনও সত্য নেই', ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ধর্মীয় চিন্তায় আচ্ছন্ন ও মত্ত সেই যুগে সত্যের সাধনায় কতটা নিষ্ঠাবান থাকলে, কত গভীরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় মগ্ন থাকলে একজনের পক্ষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব এবং কতটা চারিত্রিক বলিষ্ঠতা থাকলে এভাবে এইরকম একটা চিন্তা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করা যায়, সেটা উপলব্ধি করা আজও কত কঠিন! অথচ আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর চরিত্রের এই বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যকে বিশেষ কেউ তেমন গুরুত্বই দেয়নি তাঁর সম্পর্কে আলোচনায়। একদল বুঝেও সযত্নে এড়িয়ে গেছেন এবং তাঁকে শুধুমাত্র বিদ্যার সাগর, দয়ার সাগর, বিধবা বিবাহ প্রবর্তক, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষা সংস্কারক ইত্যাদি পরিচিতিতেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন। ফলে বেশিরভাগ মানুষ এ বিষয়ে জানতেই পারেনি। বিদ্যাসাগর তাঁর এই ধর্মীয় চিন্তাবিরোধী বক্তব্য নিয়ে যে বহু বইপত্র লিখেছেন তাও নয়। কেন লেখেননি, তাঁর নিজের কিছু বক্তব্য থেকে এর কারণ বলে আমার অন্তত যা মনে হয়েছে, সেটা আমি পরে বলব। শিক্ষা সংক্রান্ত একটি সুপারিশের প্রতিবাদে তিনি সরকারের কাছে লিখিত কয়েকটা লাইনে বিস্ময়কর চিন্তাসংবলিত এই অভিমত জানিয়েছিলেন। যদি ঐ প্রয়োজন দেখা না দিত, ইতিহাস হয়তো তাঁর এই পরিপূর্ণ সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গির কথা জানতেও পারত না। তিনি তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। বেনারস কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালেন্টাইন সাহেবকে সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করে কিছু সুপারিশ দেওয়ার জন্য সরকার থেকে পাঠানো হয়েছিল। সেই মতো

ব্যালেন্টাইন সাহেব কিছু সুপারিশ করেছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছিল সংস্কৃত কলেজে যেন বিশপ বার্কলে রচিত দর্শন সংক্রান্ত পুস্তক 'ইনকোয়ারি' পড়ানো হয়। বিশপ বার্কলে ছিলেন পাশ্চাত্ত্যের ভাববাদী দার্শনিক। তিনি বলেছেন, 'যে টেবিলে আমি লিখছি, বলতে পারি তার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু যদি আমি পড়ার ঘরের বাইরে চলে যাই তবে বলা উচিত টেবিলটা ছিল।"[১] অর্থাৎ এখন টেবিলটা নেই। কিন্তু টেবিলটা আবার বস্তু নয়, কারণ বার্কলের মতে, টেবিলটাও আমাদের নিজস্ব ধারণা বা সংবেদন ছাড়া কিছু নয়। অর্থাৎ আমার মনে হওয়া ছাড়া টেবিলটার আলাদা কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এই ধরনের বক্তব্য ছিল বার্কলের দর্শনে। এই দর্শনের মতে জগৎ-জীবন-সমাজ-বস্তুজগৎ কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই। শুধু আছে ভাব আর সংবেদন। এই দর্শনের 'ইনকোয়ারি' পুস্তক পড়াতে যখন সুপারিশ করা হল, বিদ্যাসাগর তার তীব্র প্রতিবাদ করলেন। প্রতিবাদে তিনি বললেন, "কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্য আমাদের পড়াতেই হচ্ছ। কারণগুলি এখানে বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সাংখ্য ও বেদান্ত যে ভ্রান্ত দর্শন, তা আর বিবাদের বিষয় নয়। তবে ভ্রান্ত হলেও এই দুই দর্শনের প্রতি হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধা আছে। আমাদের উচিত সংস্কৃত পাঠক্রমে এগুলি পড়ানোর সময়ে, এদের প্রভাব কাটানোর জন্য ইংরাজি পাঠক্রমে খাঁটি দর্শন দিয়ে এগুলি বিরোধিতা করা। বিশপ বার্কলের ইনকোয়ারি পড়ালে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে বলে মনে হয় না, কারণ সাংখ্য ও বেদান্তের মতোই বার্কলে একই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করেছেন। ইয়োরোপেও এখন আর বার্কলের দর্শন খাঁটি দর্শন বলে বিবেচিত হয় না, কাজেই তা পড়িয়ে উদ্দেশ্য সাধিত হবে না।"[১] এই চিঠি আবিষ্কার নাহলে ইতিহাসে কেউ জানার হয়তো সুযোগ পেত না যে, বিদ্যাসাগর অধ্যাত্মবাদী দর্শনবিরোধী কী বলেছেন। এছাড়া ব্যালেন্টাইন বলেছিলেন, সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি ও সংস্কৃত উভয় প্রকারের পাঠপদ্ধতিই হওয়া ভালো। কিন্তু দুই ভাষায় জ্ঞান-বিদ্যা চর্চা করা হলে — এদেশের বেদ-বেদান্ত যা এক ধরনের অধ্যাত্মবাদী চিন্তা, আর ইউরোপ থেকে যদি অন্য ধরনের বস্তুবাদী চিন্তা, বৈজ্ঞানিক চিন্তা এসব পড়ানো হয় — তা হলে উভয়ের প্রভাবে ছাত্রদের মধ্যে সত্য সম্পর্কে দুই ধরনের ধারণা তৈরি হবে। এ দেশের বেদ-বেদান্তের প্রভাবে এক রকম সত্যের ধারণা, আর ওদেশের বস্তুবাদের প্রভাবের ফলে সত্য সম্পর্কে আর এক ধরনের ধারণা, এই রকম দুই চিন্তা হবে। ফলে ইউরোপের বস্তুবাদী দর্শন ব্যালেন্টাইনের মতে পড়ানো ঠিক হবে না। এদেশে এর বিরুদ্ধতা করে বিদ্যাসাগর উত্তর দিচ্ছেন, "আমার বিশ্বাস, যে-ছাত্র সংস্কৃত ও ইংরেজি এই দুই ভাষায় বিজ্ঞান ও সাহিত্য বুদ্ধিমানের মতো পাঠ করেছে এবং সেটা বুঝতে চেষ্টা করেছে, তার সম্পর্কে এ রকম ভয় করার

কোনও কারণ নেই। সত্যকার ধারণা একবার যে করতে পেরেছে তার কাছে সত্য সত্যই। 'সত্য দু'রকমের', এ রকম ধারণা অসম্পূর্ণ প্রত্যয়ের ফল। সংস্কৃত কলেজে আমরা যে শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করছি, তাতে কোনও শিক্ষা থেকে ছাত্রদের মনে এ রকম ভুল ধারণা সৃষ্টি হবে না।"(২) এই প্রসঙ্গে দেশীয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের সম্পর্কে বিদ্যাসাগর বলছেন, "কোনও বিষয়ে আলাপ-আলোচনার সময় যদি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কোনও সত্যের অবতারণা করা যায়, তাহলে তাঁরা সেটা হাসি-ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেন। সম্প্রতি আমাদের দেশে... পন্ডিতদের মধ্যে একটা অদ্ভুত মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। শাস্ত্রে যার বীজ আছে, এমন কোনও বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা শুনলে, সেই সত্য সম্বন্ধে তাঁদের শ্রদ্ধা ও অনুসন্ধিৎসা জাগা দূরে থাক, তার ফল হয় বিপরীত। অর্থাৎ সেই শাস্ত্রের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস আরও গভীর হয় এবং শাস্ত্রীয় কুসংস্কার আরও বাড়তে থাকে। তাঁরা মনে করেন, যেন শেষপর্যন্ত তাঁদের শাস্ত্রেরই জয় হয়েছে, বিজ্ঞানের হয়নি।"(৩) তিনি শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের গোঁড়ামি সম্পর্কে আরও বললেন,* "আরব সেনাপতি আমরু আলেকজান্দ্রিয়া জয় করে যখন খলিফা ওমরকে জিজ্ঞাসা করেন — আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির কী ব্যবস্থা করা যেতে পারে, তখন খলিফা ওমর উত্তর দেন, এই লাইব্রেরির বইতে যদি এমন সব কথা থাকে যা কোরাণে আছে, তাহলে লাইব্রেরির দরকার নেই; আর এই লাইব্রেরির বই যদি কোরাণ বিরোধী হয়, তাহলেও লাইব্রেরির দরকার নেই, সব ধ্বংস করে দাও। ভারতীয় পণ্ডিতদের গোঁড়ামি এই আরব খলিফার গোঁড়ামির চেয়ে কম নয়। তাঁদের বিশ্বাস, যে ঋষিদের মস্তিষ্ক থেকে শাস্ত্রগুলি বেরিয়েছে তাঁরা সর্বজ্ঞ, অতএব তাঁদের রচিত শাস্ত্র অভ্রান্ত।"(১) ব্যালেন্টাইনের একটা সুপারিশের উত্তর দিতে গিয়ে কত বড় ঐতিহাসিক বক্তব্য তিনি রেখেছেন! এই বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা প্রকৃত বিদ্যাসাগরকেও জানতে পারি। ভেবে দেখুন, সে যুগে বিদ্যাসাগর কত বড় চিন্তা ও চরিত্রের অধিকারী ছিলেন! সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতেই শুধু বিস্ময়কর নয়, আজও কয়জন বলতে পারে এ ধরনের কথা?

বিদ্যাসাগর ঈশ্বর ও আত্মায় বিশ্বাস করতেন না

বিদ্যাসাগর ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না, পরলোকে বিশ্বাস করতেন না, পূজা-আহ্নিকে বিশ্বাস করতেন না। প্রশ্ন উঠলে তিনি পাল্টা নানা উত্তর দিতেন। তিনি বলছেন, "ঈশ্বরকে ডাকবার আর কী দরকার! চেঙ্গিস খাঁ যখন লুটপাট আরম্ভ করলে তখন অনেক লোককে বন্দি করলে; ক্রমে প্রায় এক লক্ষ বন্দি জমে

* এবিষয়ে ঐতিহাসিকদের মতপার্থক্য আছে। একদল যেমন এই কাহিনি বলেছেন, অপর দল বলেছেন, এটা সত্য নয়, বরং ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরীত।

গেল।..... তখন চেঙ্গিস খাঁ বললেন... ওদের বধ কর। ... এই হত্যাকান্ড তো ঈশ্বর দেখলেন? কই একটু নিবারণ তো করলেন না। তা তিনি থাকেন থাকুন, আমার দরকার বোধ হচ্ছে না।"† তিনি আরও বলছেন, " 'স্যর জন লরেন্স' বলে একটা জাহাজ ডুবে ৮০০ লোক মারা গেল, দুনিয়ার মালিক কি আমাদের চেয়েও নিষ্ঠুর? আমি যা পারি না, কেমন করে পরম করুণাময় হয়ে তিনি তা পারলেন, কেমন করে তিনি একসঙ্গে ডুবিয়ে মারতে পারলেন সাতশ-আটশ মানুষ? এই কি দুনিয়ার মালিকের কাজ?"† বিদ্যাসাগর কাশী গেছেন বাবা-মার সাথে দেখা করতে। কাশীর পাণ্ডার দল মন্দিরে নিয়ে যাওয়ার জন্য টানাটানি করছে। তিনি বলছেন, আমি ওসব মানি না। আমার বাবা বিশ্বেশ্বর, মা অন্নপূর্ণা, আর কাউকে আমি মানি না। তিনি জীবনে কোনও দিন কোনও মন্দিরে যাননি। দীক্ষা নেওয়ার জন্য বাবা-মা-ঠাকুরমা সকলে জোর করেছেন, কিন্তু কিছুতেই রাজি হননি, অথচ তাঁদের তিনি খুবই মানতেন। কিন্তু তাঁর কাছে সত্য সবকিছুর ঊর্ধ্বে। তাঁকে কোনও দিন পূজা-আহ্নিক করতেও কেউ দেখেনি। বিদ্যাসাগর এসব বিশ্বাসই করতেন না। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখছেন, এক পাদ্রী একদিন তাঁদের ঈশ্বর তত্ত্ব বোঝাচ্ছিলেন। বিদ্যাসাগর পাদ্রীকে বললেন, ওদের অল্প বয়স, এখন ওদের ওসবে দরকার নেই, আমার দরকার আছে, আমার কাছে আসুন। পাদ্রী এলে বিদ্যাসাগর একটার পর একটা প্রশ্ন করতে লাগলেন। পাদ্রী তখন খেপে গিয়ে বললেন, বিদ্যাসাগরের নরকেও স্থান হবে না। এরকম কত ঘটনা আছে! এসব নিয়ে অনেক রসিকতাও তিনি করেছেন। একদিন বিদ্যাসাগর বসে গল্পগুজব করছেন, এমন সময় দু'জন ধর্মপ্রচারক ও কয়েকজন ভদ্রলোক এসে বিদ্যাসাগরকে বললেন, বাংলা দেশে ঈশ্বর নিয়ে খুব তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে, আপনি পণ্ডিত, এর একটা মীমাংসা করে দিন। বিদ্যাসাগর বলছেন, ঈশ্বর আছে কি নেই, এর উত্তর কেউ কোনও দিন দিতে পারবে না, এর সমাধানও কোনও দিন হবে না। তারপর বিদ্যাসাগর হেসে তাদের একটি গল্প বললেন। একবার যমরাজের কাছে একটি লোককে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে। যমরাজ বলছেন, তুমি অমুকের উপাসনা না করে অমুকের উপাসনা কেন করলে? সে বলল, আমাকে এক ধর্মপ্রচারক এরকম বুঝিয়েছিল। যমরাজ বললেন, একে কয়েক ঘা বেত মারো, তারপর যে বুঝিয়েছিল তাকে আরও বেত মারো। তাকে যে বুঝিয়েছিল তাকেও আরও বেত মারা হল। এভাবে একের পর এককে মারা হল। এরকম করতে করতে সর্বশেষ লোকটি বলল, আমাকে বিদ্যাসাগর বুঝিয়েছিল। তখন যমরাজ বললেন, সকলকে যত বেত মেরেছ, সেই পরিমাণ বেত বিদ্যাসাগরকে মারো, তারপরে বাড়তি আরও মারো। তাতেও যমরাজের রাগ কমল না। যমরাজ বললেন, এর অপরাধ এত বেশি যে, ওকে রোজ বেত মারতে হবে। এরকম

সব নানা কথা রস করে বিদ্যাসাগর বলতেন। আরেকবার ঠাট্টাচ্ছলে শিবনাথ শাস্ত্রীর বাবা বিদ্যাসাগরের বন্ধু হরানন্দ ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শুনলাম কাশীবাসী হয়েছো। বলি, একটু গাঁজাটাজা খেতে শিখেছো তো?' হরানন্দবাবু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, কেন, গাঁজা খেয়ে কী হবে? বিদ্যাসাগর ব্যাখ্যা করে বললেন, 'ধরো তোমার যদি কাশীপ্রাপ্তি হয়, তাহলে তো শিব হবে। শিব হলে তোমার নন্দী-ভৃঙ্গী যখন গাঁজার আলবোলা ধরবে তখন টানতে হবে তো। আগে থেকে অভ্যাস না রাখলে দম আটকে মরে যাবে, আর তোমার এত সাধের শিবত্ব ফসকে যাবে।' উপস্থিত সকলেই হো হো করে হেসে উঠলেন। এই ধরনের নানা ঘটনা, বিভিন্ন বিষয়ে বিদ্যাসাগরের বক্তব্য, তাঁর সম্পর্কে অন্যদের মতামত ইত্যাদি সংগ্রহ করে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রমিত্র মহাশয় মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ একটি বই 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' রচনা করেছেন। আমি ওই বই থেকে বেশ কিছু তথ্যের সাহায্য নিয়েছি।

বিদ্যাসাগর চিন্তায় কতটা সেক্যুলার ছিলেন তা বুঝতে তাঁর নিজের রচিত 'জীবনচরিত' সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলতে চাই। লক্ষণীয় যে এই পুস্তকের লেখায় কোথাও কোনও অবতারের চিহ্নমাত্র নেই, কোথাও ঈশ্বর সম্পর্কে কোনও উল্লেখ নেই, যা উল্লেখ করা সেই যুগে এবং এমনকী আজকের দিনেও রেওয়াজ হয়ে আছে। তিনি বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও, কোপারনিকাস, নিউটনের জীবনী লিখেছেন; ডুবাল, জেনঙ্কেসরা গরিব অবস্থা থেকে কীভাবে লড়াই করে পড়াশোনা করে বড় হয়েছেন, — এসব কাহিনী লিখেছেন ছোটদের এসব চরিত্র থেকে অনুপ্রাণিত করার জন্য। 'বোধোদয়' পুস্তক নিয়ে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে। বোধোদয়ের প্রথম দু'টি সংস্করণ প্রকাশিত হতে দেখা গেল দু'টিতেই ঈশ্বর সম্পর্কে কোনও কথা নেই। এ নিয়ে ইউরোপীয় মিশনারিদের একটি অংশ প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন। জন মার্ডক নামে সরকার নিযুক্ত একজন মিশনারি এ নিয়ে তদন্তে আসেন। তাঁর রিপোর্ট খুব তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি রিপোর্টে বললেন, বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়' পুস্তকটি ইংল্যান্ডে মেসার্স চেম্বার্স কর্তৃক প্রকাশিত 'দ্য রুডিমেন্টস অফ নলেজ' পুস্তককে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে, কিন্তু মূল পুস্তকে আলোচিত 'ঈশ্বর' ও 'আত্মা' সম্পর্কিত অংশ 'বোধোদয়' থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই বইয়ে সেন্সেস বা ইন্দ্রিয়ানুভূতির যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তার দ্বারা চরম বস্তুবাদ (র‍্যাঙ্ক মেটিরিয়ালিজম) শেখানো হবে। এই বই কেবল একজন নিরীশ্বরবাদীর (সেক্যুলারিস্ট) দ্বারা লিখিত তা নয়, এই বই প্রস্তুত করাই হয়েছে নিরীশ্বরবাদ শেখানোর জন্য।[১] বিদ্যাসাগর লিখেছেন, মানুষ মারা গেলে তার সৎকার হয়, কিন্তু একথা লেখেননি যে আত্মা অবিনশ্বর। কারণ, বিদ্যাসাগর আত্মা মানতেন না, বিদ্যাসাগর তাঁর লেখায়

কোথাও 'ভগবানের পূজা' ইত্যাদি কথা আনেননি। মার্ডক বলছেন, বিদ্যাসাগরকে যে 'হিন্দু সংস্কারক' বলা হয়, তা ঠিক নয়। বিদ্যাসাগর কোনও হিন্দু ধর্মীয় আন্দোলনে নেই, ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনেও নেই, তিনি হচ্ছেন সমাজ-সংস্কারক। তিনি আরও বললেন, ইংল্যান্ডে রবার্ট ওয়েন, সেইন্ট সাইমন যেমন সেক্যুলার, বিদ্যাসাগরও তাই। অতএব যত দ্রুত এই বই স্কুলের পাঠক্রম থেকে বাতিল করা যায়, ততই মঙ্গল। এই রিপোর্ট সরকারকে দিলেন জন মার্ডক। এরপর সরকারি নির্দেশে বোধোদয়ের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল। তখন বাধ্য হয়ে অনুরাগীদের পরামর্শে বিদ্যাসাগর তৃতীয় সংস্করণে ঈশ্বর নিয়ে একটা অধ্যায় লিখলেন অত্যন্ত দায়সারা করে দুর্বোধ্যভাবে। তাও বইটি প্রথমে শুরু করলেন পদার্থ দিয়ে, ঈশ্বর দিয়ে নয়। অর্থাৎ প্রথমে পদার্থ নিয়ে আলোচনা, তারপর ঈশ্বর নিয়ে। এভাবে কোনওরকমে সমালোচকদের মুখ বন্ধ করলেন যাতে বইটি প্রকাশিত হতে পারে।

আশ্রম জীবনে ধর্মের নামে কী কদর্য কাজকর্ম চলে, সেটা বোঝাতে একটা ছোট গল্পও বিদ্যাসাগর লিখেছেন। এসব কাজ অনেকদিন ধরেই চলছে, এখনও অহরহ ঘটছে। এ গল্প শুনলে ধর্মান্ধরা আজও অনেকেই হাতাহাতি শুরু করে দেবে। তিনি দেখাচ্ছেন, এই সব আশ্রমে ধর্মের নামে কী চলে! কোনও এক আশ্রমের এক সাধু রোজ ধর্মকথা প্রচার করে, পাপপুণ্য বোঝায়। অনেকে জড়ো হয়ে ভক্তি সহকারে শোনেন। সেই সাধুর একজন সেবাদাসীও আছে। এই সেবাদাসী রোজই সাধুর সবরকমেরই সেবা করে। বুঝতেই পারেন, সব রকম সেবা বলতে কী বোঝায়! একদিন বিকালে সেই সন্ন্যাসী বোঝাচ্ছে, যেসব নারী পরপুরুষকে গ্রহণ করে, মৃত্যুর পরে তাদের শুধু নরক বাসই হয় না, একটা গাছে জ্বলন্ত লোহার বর্শা থাকে, যমরাজের দূত পিছন থেকে মারতে থাকে, আর বলে ওই জ্বলন্ত লোহার বর্শাকে জড়িয়ে ধর, যেমন ক'রে তুমি পরপুরুষকে আলিঙ্গন করেছ। এই কথা শুনে সেদিন সন্ধ্যাবেলা সেই সেবাদাসী অন্যান্য কাজ সেরে দরজা পর্যন্ত এসে আর ঘরে ঢুকছিল না। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার? সেবাদাসী উত্তর দিল, আপনি যা বলেছেন তারপর তো আমার এই ঘরে ঐ সব সেবা করা আর চলে না। তখন সন্ন্যাসী একগাল হেসে বলল, তুমি কি পাগল হয়েছ? সেই গাছ কি আর এখন সেরকম আছে? এতদিন ব্যবহার হতে হতে ক্ষয়ে গিয়ে সেই গাছের সেই লোহার বর্শা আর নেই, এখন কোনও কষ্ট হয় না। ভেতরে এসে নির্ভয়ে আমাকে সেবা কর।[১] এই বলে হাত ধরে তাকে ভেতরে টেনে নিয়ে গেল। আপনারা একবার চিন্তা করুন, সেই যুগে কী তীব্র শ্লেষে এই সব ধর্মাচরণের নামে গড়ে তোলা আশ্রমগুলিকে তিনি কষাঘাত করে গেছেন।

শেষ জীবনে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত অসুস্থ, কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। অনেকে তখন বলেছে ভগবানের নাম নিতে। কিন্তু, তিনি তা করেননি। বড় মেয়ে তাঁর কাছে থাকত, ধর্মে বিশ্বাসী ছিল, পিতার জন্য হোম করছে। মেয়ে তাঁকে হোম-এর ঘরে নিয়ে যাবার জন্য টানাটানি করছে, কিন্তু তিনি যাবেন না। বারবার আবেদনে তিনি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এখানে আছি, কিন্তু চারদিকে বড় ধোঁয়া।' এই 'বড় ধোঁয়া' কথাটাও ইঙ্গিতপূর্ণ। অর্থাৎ সবটাই 'ধোঁয়া', আর কিছু নেই। আপনারা জানেন, রামকৃষ্ণ একবার বিদ্যাসাগরের বাড়িতে যান শ্রদ্ধা জানাতে। রামকৃষ্ণও বড় চরিত্রের মানুষ ছিলেন। এই ঘটনা ও আলোচনা অনেকেই বর্ণনা করেছেন। খুবই রসগ্রাহী আলোচনা হয়েছিল দু'জনের মধ্যে সেদিন। তিনি বিদ্যাসাগরকে বলছেন, বিদ্যার সাগরকে দেখতে এলাম। বিদ্যাসাগর উত্তর দিলেন, এসেছেন যখন, তখন সাগর থেকে কিছু নোনা জল নিয়ে যান। এরপর রামকৃষ্ণ বলছেন, নোনা জলে না ডুবলে মুক্তো পাব কী করে? তুমি তো বিদ্যার সাগর, অবিদ্যার নও। কথা প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ বলছেন, ভগবান কাউকে শক্তি দেয়, কাউকে দেয় না। কাউকে বড় করে, কাউকে ছোট করে। তখন বিদ্যাসাগর প্রশ্ন করছেন, ভগবান কাউকে শক্তি দেয়, কাউকে কেন দেয় না? রামকৃষ্ণ বললেন, তা না হলে তোমাকে এত লোক মানে কেন? বিদ্যাসাগর বিতর্কে না গিয়ে একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন। কারণ বিদ্যাসাগর এসব বিশ্বাস করতেন না। বিদ্যাসাগর 'জীবনচরিতে' লিখেছেন, কীভাবে সাধারণ রাখাল বালকও অপরের বাড়িতে কাজ করে সংগ্রাম করে করে বড় হয়েছে। তিনি জানতেন, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষ বড় হয়। প্রতিভা, ক্ষমতা ঈশ্বরদত্ত জিনিস — এসব কথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। রামকৃষ্ণ তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন, সরাসরি কালীমন্দিরে যাওয়ার কথা বলেননি। জানতেন, কালীমন্দির বললে বিদ্যাসাগর হয়তো একেবারে না বলে দেবেন। সতর্কতার সাথে বললেন, আপনি একবার রাসমণির বাগান দেখতে চলুন। বিদ্যাসাগর না-ও বলেননি, আবার হ্যাঁ-ও বলেননি। রামকৃষ্ণ ধরে নিয়েছেন, বিদ্যাসাগর যাবেন। কিন্তু এত কাছে থাকা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর দক্ষিণেশ্বরে যাননি। স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কত দূরদূরান্তরে ছুটে গেছেন। তাঁর এক গরিব বন্ধুর জন্য চাকরির খোঁজ পেয়েছেন, তাঁকে পরদিন হাজির করাতে হবে, কলকাতা থেকে সোজা একদিনে কালনা হেঁটে চলে গেলেন তাঁর বাড়ি। কিন্তু, বিদ্যাসাগর লৌকিকতার খাতিরেও অনুরোধ রক্ষার্থে দক্ষিণেশ্বর যাননি। কারণ যুক্তি দিয়ে তিনি যে সত্য উপলব্ধি করেছেন, আচরণে তার বিরুদ্ধতা করা, কোন কারণে কোন অজুহাতে মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া তাঁর স্বভাববিরোধী ছিল।

বিদ্যাসাগর সে যুগে নিরীশ্বরবাদী ছিলেন, অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন। ইউরোপে

রেনেসাঁসের যুগটাই ছিল যান্ত্রিক বস্তুবাদের যুগ। বেকন, হব্‌স, লক, স্পিনোজা, লামের্টিয়ারদের বক্তব্য নিয়ে তখন ইউরোপে বস্তুবাদের জোয়ার চলছে। বস্তুবাদকে ভিত্তি করে কান্টের অজ্ঞেয়বাদ, ফুয়েরবাখের মানবতাবাদ এসব এসেছে। এইসব চিন্তার সাথে বিদ্যাসাগরের খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। বিদ্যাসাগর ভগবান মানতেন না, ঈশ্বর মানতেন না, দেবতা মানতেন না, পূজা-আর্চায় বিশ্বাস করতেন না, তবুও এদেশে কিন্তু তাঁর প্রতি সকলেই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। অথচ সে সময় এদেশে প্রচলিত গভীর বিশ্বাস ছিল, ঈশ্বর না মানলে, ভগবান না মানলে চরিত্র হয় না, মানুষ বড় হয় না। আজও এই ধারণা সমাজে প্রবলভাবে আছে। বিদ্যাসাগর ভগবান মানতেন না, তা জেনেও রামকৃষ্ণ কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, আমার জীবনে দু'জন বড় মানুষ, একজন রামকৃষ্ণ, আর অপরজন বিদ্যাসাগর। সেই সময়ে গ্রামেগঞ্জে, দূরদূরান্তে এমনও আলোচনা হত যে, কলকাতায় টাকাকড়িতে বড়লোক বেশ কিছু আছে, কিন্তু মহত্ত্বে বড় একজনই আছেন, কলকাতা যাওয়া মানে কালীঘাটের কালী মন্দির আর মহান বিদ্যাসাগরকে দর্শন করা। নিরীশ্বরবাদী হয়েও এরকম শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বিদ্যাসাগর। আমি সর্বপ্রথমে এই দিকটা এতক্ষণ আলোচনা করলাম এই কারণে যে, বিদ্যাসাগরের এই দিকটা এদেশে সব থেকে কম আলোচিত এবং সব থেকে কম পরিচিত হয়ে আছে।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সেক্যুলার শিক্ষা প্রচলনে বিদ্যাসাগর

শিক্ষার যে আন্দোলন তিনি শুরু করেছিলেন, তা এই ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত সেক্যুলার মানবতাবাদী চিন্তা ও কর্মের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল। বিদ্যাসাগর গ্রামে-শহরে বহু স্কুল স্থাপন করেছিলেন, এটা অনেকেই জানেন। তিনি ভিক্ষা করে করেও স্কুল করেছেন। কিন্তু, সেটা নিছক কিছু স্কুল-কলেজে ছাত্রদের পড়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য নয়। আপনারা শুনলে অবাক হবেন, বিদ্যাসাগর ইংরেজি শিখেছেন ২২ বছর বয়সে। তার আগে সংস্কৃত পড়তেন, বাংলা জানতেন। হয়তো প্রথমদিকে এ বি সি ডি এইরকম কিছু জানতেন, এই পর্যন্ত। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকরি করার সময় তাঁর গুণমুগ্ধ একজন ইউরোপীয়ান মার্শাল সাহেব তাঁকে ইংরেজি শিখতে পরামর্শ দেন। তারপর তিনি ইংরেজি পড়ে এবং ইংরেজি শিক্ষার সংস্পর্শে এসে পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডারের সন্ধান পান এবং প্রবল জ্ঞানপিপাসায় এই রত্নভাণ্ডারে ডুবে যান। নিউটনের রচনাসহ এমন কোনও আধুনিক চিন্তা সমন্বিত পাশ্চাত্যের পুস্তক ছিল না, যেটা তাঁর সংগ্রহশালায় ছিল না। আবার এদেশের সকল ধর্মশাস্ত্রও তাঁর প্রায়

কণ্ঠস্থ ছিল। পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণ করে বিদ্যাসাগর মাত্র ৩৩-৩৪ বছর বয়সে লিখছেন 'বেদান্ত-সাংখ্য ভ্রান্ত দর্শন'। তিনি সংস্কৃত কলেজে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বাংলা ভাষার বিকাশের জন্য সংস্কৃত পড়া যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই চাই, এর বেশি নয় — নিছক সংস্কৃত শাস্ত্র পড়ার জন্য নয়। ফলে বাংলা ভাষার বিকাশের জন্যই সংস্কৃত পড়া যতটুকু দরকার, তখনকার দিনে ততটুকুই তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, যে পথে তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তার সংস্পর্শে এসেছিলেন ইংরেজি ভাষা শিখে, ঠিক সেই পথেই ভারতবর্ষের ছাত্রসমাজ তাঁরই মতো ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে বেদ-বেদান্ত-সাংখ্য-অধ্যাত্মবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হবে এবং এরই ভিত্তিতে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিন্তায় অগ্রসর হবে। এই ছিল সেদিন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। না হলে, এমনি এমনি স্কুল করা, কলেজ করা, গ্রামে গ্রামে ছুটে বেড়ানো, এসব তিনি করতেন না। তিনি বলছেন, 'যেখানেই আধুনিক ইউরোপীয় জ্ঞানের আলো পৌঁছেছে, এবং যতটুকু পৌঁছেছে, সেখানে ততটুকু এদেশীয় শাস্ত্রীয় বিদ্যার প্রভাব কমছে। ফলে এই শিক্ষার প্রসার বাড়াতে হবে'।† লক্ষ করবেন, তিনি তাঁর বিবেচনা অনুযায়ী বুঝেছেন, ধর্মীয় শাস্ত্র সত্য কি মিথ্যা, ভগবান আছেন কি নেই, এসব নিয়ে শুধু তর্ক-বিতর্ক চালিয়ে গেলে, বড় বড় পুস্তক লিখলে এই ধর্মান্ধ সমাজে বিশেষ কিছু কাজ হবে না, শুধু বাক্যযুদ্ধই চলবে। এভাবে পণ্ডশ্রম না করে বরং তিনি নিজে যেভাবে ধর্মীয় চিন্তা, ঈশ্বরে বিশ্বাস এসব ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, সেই পথেই, অর্থাৎ ইংরেজির মাধ্যমে পাশ্চাত্যের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পথেই এদেশকে এইসব মিথ্যা ধারণা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তার জন্য চেয়েছিলেন, আধুনিক সেক্যুলার শিক্ষার প্রচলন। আর এজন্যই বার্কলের ভাববাদী দর্শন পড়ানোর বিরুদ্ধতা করেছিলেন। নারীশিক্ষার প্রসারও চেয়েছেন, যাতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে নারীর জাগরণ হয়, তারা ধর্মীয় চিন্তামুক্ত হয়, নারীদের মধ্যে আত্মসম্ভ্রম, অধিকার ও স্বাধীনতা বোধ আসে। একান্তভাবে তিনি এসবই চেয়েছেন। এই শিক্ষা বিস্তারের জন্য মাসের পর মাস, বছরের পর বছর দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, জেলার পর জেলায় গ্রামে গ্রামে ছুটে বেড়িয়েছেন, একের পর এক স্কুল স্থাপন করেছেন!

বাংলা বর্ণ-র সাথে তিনি সকলেরই পরিচয় করিয়ে দিয়ে গেছেন — বর্ণপরিচয়, কথামালা, বোধোদয় প্রভৃতি পুস্তকের মাধ্যমে। কতকগুলি সাহিত্য রচনা করেছেন আধুনিক সাহিত্যের পথপ্রদর্শক হিসাবে। ব্যাকরণ কৌমুদী রচনা করেছেন দুর্বোধ্য ব্যাকরণকে সহজবোধ্য করার জন্য। বলেছেন, 'সংস্কৃতে অঙ্ক শেখানো খুব জটিল কাজ এবং সময় লাগে। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে অঙ্ক শেখানো হোক,

অর্ধেক সময়ে শিখবে'। বিদ্যাসাগর বলছেন, 'শিক্ষা বলতে শুধু রিডিং, রাইটিং ও অ্যারিথমেটিক নয়, যথার্থ ও পূর্ণ শিক্ষা দাও। ভূগোল, জ্যামিতি, সাহিত্য, ন্যাচারাল ফিলজফি, মরাল ফিলজফি, ফিজিওলজি, পলিটিকাল ইকনমি ইত্যাদি শিক্ষা দরকার।'† তিনি বলছেন, 'এমন শিক্ষক চাই যারা বাংলা ভাষা জানে, ইংরেজি ভাষা জানে, আর ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত।'† এর আগে ব্রিটিশরা মনে করত, এদেশের লোক ইংরেজি শেখাতে পারবে না। চ্যালেঞ্জ দিয়ে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন কলেজে বাঙালিকে দিয়ে ইংরেজি পড়িয়েছেন। কর্তৃপক্ষ তাদের এল এ, বি এ পরীক্ষা দিতে দেবে না। লড়াই করে তিনি সেইসব পরীক্ষা চালুর দাবি আদায় করেছেন এবং সেখান থেকে ছাত্ররা পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় স্থান পর্যন্ত দখল করেছিল। ফলে তাঁর এই শিক্ষা-বিস্তারের কর্মসূচির একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তিনি যে চিন্তায় বিশ্বাস করতেন, অর্থাৎ ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত সেক্যুলার মানবতাবাদ, তার প্রচার হোক, চর্চা হোক, আধুনিক মনন জাগুক, শিক্ষিত মন ধর্মীয় চিন্তা থেকে মুক্ত হোক। তিনি একথা বুঝেছিলেন যে, বই লিখে, বক্তৃতা দিয়ে ধর্ম বিশ্বাস, কুসংস্কার কাটানো যাবে না। শিক্ষার বিস্তারের মাধ্যমে, জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে তা করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে আরেকটা বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগর তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলে ছাত্রদের দৈহিক শাস্তি নিষিদ্ধ করেছিলেন, শিক্ষকদের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও। কারণ এতে ছাত্রদের পড়ার আগ্রহ ও আত্মমর্যাদাবোধ আহত হয়। ক্লাসে একজন ছাত্র কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে একই প্রশ্নের উত্তর তার সহপাঠী কারোর কাছ থেকে শিক্ষকেরা যাতে জানতে না চান, তাও বলেছিলেন। কারণ তাতে প্রথম ছাত্রটির আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগতে পারে। এসব প্রশ্নেও এইভাবে তিনি নতুন দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। ব্রিটিশ পরিচালিত এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার নামে বাস্তবে কী চলছে, এ সম্পর্কে তিনি লক্ষ্ণৌতে পূর্ণবাবু নামে একজনকে যেকথা বলেছেন, সেটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্ণবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আই এ, বি এ, এম এ পাশ করে যারা বেরোচ্ছে, তারা সকলেই 'আই হ্যাভ' না লিখে 'আই হ্যাজ' লেখে কেন'? বিদ্যাসাগর শ্লেষের সাথে একটা কঠোর সত্য কথা বলেছিলেন। তিনি বলেন, 'আমাদের যেসব ছেলে আছে, তাদের কাছ থেকে আমরা মাইনে নিই, পাঙ্খা ফি নিই, একজামিনেশন ফি নিই। নিয়ে কলের দোর খুলি। বলে দিই, এখানে মাস্টার আছে, এখানে বেঞ্চি-চেয়ার-বই আছে, এখানে কালি-কলম-দোয়াত-পেন্সিল সবই আছে। বলে তাদের কলের ভেতরে ফেলে চাবি ঘুরিয়ে দিই। কিছুকাল পরে কলে তৈরি হয়ে তারা কেউ সেকেন্ড ক্লাস দিয়ে, কেউ এন্ট্রেন্স হয়ে, কেউ এল এ হয়ে, কেউ বি এ হয়ে, কেউ এম এ হয়ে বেরোয়। কিন্তু সবাই লেখে 'আই হ্যাজ', এক পাকের কিনা।'† সেদিন ব্রিটিশ শাসিত শিক্ষাব্যবস্থার যে

হাল দেখে তিনি এই শ্লেষোক্তি করেছেন, লক্ষ করে দেখুন, আজকের দিনে ভারতবর্ষে সেটা বাস্তবে সহস্রগুণ মর্মান্তিক সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যাসাগর কিন্তু মামুলি অর্থে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার কিছু সংস্কার চাননি। তিনি চেয়েছেন ও আজীবন লড়েছেন একদিকে প্রাচীন শাস্ত্র নিয়ন্ত্রিত ধর্মীয় শিক্ষা ও অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসিত কেরানি আমলা তৈরির শিক্ষাব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে নবযুগের নব মানুষ তৈরির স্বার্থে বিজ্ঞানভিত্তিক সেক্যুলার মানবতাবাদী শিক্ষাব্যবস্থা ও সিলেবাস চালু করতে। তিনি শিক্ষাব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনই চেয়েছিলেন। এই জন্যই তাঁকে নিছক একজন শিক্ষা সংস্কারক বলা চলে না। কারণ সংস্কার হচ্ছে মূল জিনিষকে অক্ষুণ্ণ রেখে নিছক উপর উপর কিছু পরিবর্তন করা।

বাংলা গদ্যের বিকাশে বিদ্যাসাগরের ঐতিহাসিক অবদান

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটা সুন্দর অভিব্যক্তি আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন।..... বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে বিদ্যাসাগর সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন।"[১] রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমি সাহিত্য কিছু করেছি — একথা যদি এদেশের লোক কিছু স্বীকার করে থাকে, তাহলে অবশ্যই আমাকে স্বীকার করতে হবে, এই সাহিত্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছেন বিদ্যাসাগর।" বলেছেন, "জল পড়ে, পাতা নড়ে' আদি মহাকবির এই রচনার থেকে আমি জানতে পারলাম ছন্দ, মীড়, ঝঙ্কার।"[২] রবীন্দ্রনাথের বড়ত্ব এখানেই। বঙ্কিমচন্দ্র যদি এভাবে বলতে পারতেন, তাহলে তিনি ইতিহাসে অন্য একটা জায়গা পেতেন। বিদ্যাসাগর যে আধুনিক বাংলা গদ্যভাষার বিকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন, সেটা কি নিয়েছিলেন নিছক একজন ভাষাবিদ্ হিসাবে? না, তা নয়। ইউরোপেও গদ্য এসেছে পদ্য থেকে একটা সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনে, ইতিহাসের বিশেষ স্তরে। নবজাগরণ এনেছে নব নব চিন্তা, নব নব আবিষ্কার, নব নব প্রকাশ, চিন্তার ব্যাপক অগ্রগতি, যুক্তিবাদী মনন, সুসংহত চিন্তার প্রকাশ, আর এসবের জন্য চাই ভাষার সুশৃঙ্খল, সুসংহত, precise নব নব প্রকাশভঙ্গিমা, পদ্যের মাধ্যমে যেটা সম্ভব নয়। সেইজন্য সব দেশেই দেখা যায়, প্রথম যুগে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা পদ্যের মাধ্যমে হলেও একটা স্তরে এসে এই নবজাগরণের যুগেই পদ্যের গর্ভ থেকে গদ্যের জন্ম ঘটল। এই ক্ষেত্রেও বাংলায় গদ্যের বিকাশে বিদ্যাসাগরের ঐতিহাসিক অবদান রয়েছে। বাংলা গদ্যের বিকাশ ও গদ্য সাহিত্য সৃষ্টির জন্য তাঁর এই অক্লান্ত প্রয়াসের পিছনেও একমাত্র কারণ ছিল যাতে এদেশে মানবতাবাদী চিন্তা, যুক্তিবাদী মননের বিকাশ

ঘটানো যায়। এজন্যই সমাজচ্যুত ও ধিক্কৃত মাইকেল মধুসূদনের অসংযত জীবনযাত্রা, অপব্যয় এসব জানা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর তাঁকে খুবই ভালোবাসতেন। তিনি আসল মধুসূদনকে চিনেছিলেন। এই উজ্জ্বল সাহিত্য রত্নকে বাংলা সাহিত্যের বিকাশের প্রয়োজনেই বাঁচিয়ে রাখবার জন্য বিদ্যাসাগর নিজে বহুবার ঋণগ্রস্ত হয়েছিলেন, তবুও শেষপর্যন্ত মধুসূদনকে বাঁচাতে পারেননি বলে আক্ষেপ করেছেন। মাইকেলের মৃত্যুর পর তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একদল মানুষ বিদ্যাসাগরের কাছে যান। তিনি তাঁদের আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "দ্যাখো, প্রাণপণ চেষ্টা করে যার জান রাখতে পারিনি, তার হাড় রাখবার জন্য আমি ব্যস্ত নই।"† প্রকৃত বাংলা সাহিত্য কারা রচনা করতে সক্ষম, এ সম্পর্কেও পথনির্দেশ করে তিনি বলেছিলেন, "যাঁরা ইউরোপীয় আকর থেকে জ্ঞানবিদ্যার উপকরণ আহরণ করতে সক্ষম নন এবং সেগুলিকে ভাবগম্ভীর, প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম, তাঁরা এই সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না।"† অর্থাৎ যারা ইউরোপের খনি থেকে 'জ্ঞানবিদ্যার উপকরণ আহরণ করে' সেগুলিকে ভাবগম্ভীর, প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হবে, তারাই বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবে।

বাল্যবিবাহ বন্ধের আন্দোলন

পরবর্তী যে বিষয়ে আমি আলোচনা করতে চাই সেটা হল, তাঁর বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের সংগ্রাম এবং বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ বন্ধ করার আন্দোলন। এইসব আন্দোলনও একই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হয়েই তিনি করেছিলেন। এখানে বিদ্যাসাগরের কিছু লেখা আপনাদের পড়ে শোনাব। কী দুঃসহ ব্যথা, কী মর্মান্তিক অনুভূতি, কী বিরল দরদী মন ও গভীর দৃষ্টি থেকে তিনি লিখেছেন, যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন। আবার অনেকেই হয়তো এসব পড়াশোনার সুযোগ পাননি। বাল্যবিবাহ তখন এদেশে প্রচুর হত, যা তুলনায় কম হলেও আজও অনেক হয়। এ বিষয়ে তিনি বলছেন, "বাল্যকালে বিবাহ হওয়াতে বিবাহের সুমধুর ফল যে পরস্পর প্রণয় তাহা দম্পতিরা কখনও আস্বাদ করিতে পায় না, সুতরাং পরস্পরের সপ্রণয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহকরণ বিষয়েও পদে পদে বিড়ম্বনা ঘটে, আর পরস্পরের অত্যন্ত অপ্রীতিকর সম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহাও তদনুরূপ অপ্রশস্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আর নববিবাহিত বালক-বালিকারা পরস্পরের চিত্তরঞ্জনার্থে রসালাপ, বিদগ্ধতা, বাক্‌চাতুরী, কামকলাকৌশল প্রভৃতির অভ্যাসকরণে ও প্রকাশকরণে সর্বদা সযত্ন থাকে, এবং তদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপায় পরিপাটী পরিচিন্তনেও তৎপর থাকে, সুতরাং তাহাদিগের বিদ্যালোচনার বিষম ব্যাঘাত জন্মিবাতে সংসারের সারভূত বিদ্যাধনে বঞ্চিত হইয়া কেবল মনুষ্যের আকারমাত্রধারী, বস্তুতঃ প্রকৃতরূপে মনুষ্যগণনায় পরিগণিত হয় না।"[১] দেখুন,

সেইযুগে বিদ্যাসাগর চিন্তায় কত আধুনিক ও বাস্তববাদী ছিলেন। তিনি বলছেন, প্রণয় বা ভালবাসা ছাড়া বিবাহিত জীবন সুখের হয় না — বাল্যবয়সে যেটা হওয়া অসম্ভব। আর বলছেন, ভালবাসাহীন জীবন শুধু দুঃখের হয় তাই নয়, যে সন্তানরা আসে তাদেরও বিকাশ ব্যাহত হয়। আর এই অতি অল্প বয়সে বিবাহিত জীবনে দৈহিক সম্পর্কজনিত উন্মাদনার কারণে পড়াশোনা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর তার ফলে যথার্থ শিক্ষায় বঞ্চিত হয়ে বালক-বালিকারা শুধু মানুষের আকারধারী হয়, প্রকৃত মানুষ হয় না। দেখুন, মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য যথার্থ শিক্ষার উপর তিনি কতটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন!

বিদ্যাসাগর এই ভালোবাসাহীন বিবাহিত জীবনের পরিণতি কী হয় সেই প্রসঙ্গেও সেই যুগে বলছেন, "মনের ঐক্যই প্রণয়ের মূল। সেই ঐক্য বয়স, অবস্থা, রূপ, গুণ, চরিত্র, বাহ্য ভাব ও আন্তরিক ভাব ইত্যাদি নানা কারণের উপর নির্ভর করে। অস্মদ্দেশীয় বালদম্পতিরা পরস্পরের আশয় জানিতে পারিল না, অভিপ্রায়ে অবগাহন করিতে অবকাশ পাইল না, অবস্থার তত্ত্বানুসন্ধান পাইল না, আলাপ-পরিচয়ের দ্বারা ইতরেতরের চরিত্র পরিচয়ের কথা দূরে থাকুক, একবার অন্যোন্য নয়নসঞ্চটনও হইল না, কেবল একজন উদাসীন বাচাল ঘটকের প্রবৃত্তিজনক বৃথা বচনে প্রত্যয় করিয়া পিতামাতার যেরূপ অভিরুচি হয়, কন্যা-পুত্রের সেই বিধিই বিধিনিয়োগবৎ সুখদুঃখের অনুল্লঙ্ঘনীয় সীমা হইয়া রহিল। এই জন্যই অস্মদ্দেশে দাম্পত্যনিবন্ধন অকপট প্রণয় প্রায় দৃষ্ট হয় না, কেবল প্রণয়ী ভর্তাস্বরূপ এবং প্রণয়িনী গৃহপরিচারিকাস্বরূপ হইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করে।"(১) অল্পবয়সে বিয়ে হলে কী ক্ষতি হয়, এখানে তিনি তা আলোচনা করেছেন। সেই যুগে চিন্তায় কতটা আধুনিক ও মানবিক থাকার ফলে তিনি বলতে পারলেন, 'মনের ঐক্যই প্রণয়ের মূল', বিবাহের পূর্বে পাত্রপাত্রীর পরস্পরের মধ্যে পরিচয়, গুণাগুণের বিচার করার সুযোগ না থাকায় শুধুমাত্র ঘটক ও পিতামাতার সিদ্ধান্তেই বিবাহ হওয়ায় পারস্পরিক ভালোবাসা, মর্যাদা ইত্যাদি না গড়ে ওঠায় স্বামী শুধুমাত্র 'ভর্তাস্বরূপ' এবং স্ত্রী 'গৃহপরিচারিকা' হিসাবে জীবনযাপন করে। সামন্ততান্ত্রিক সেই যুগের বিবাহিত জীবনের কী করুণ, নিষ্ঠুর ছবি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, যার প্রভাব আজকের পুঁজিবাদী সমাজেও যথেষ্ট রয়ে গেছে।

ধর্মে অবিশ্বাসী হয়েও তিনি বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের সংগ্রামে ধর্মশাস্ত্রকে ব্যবহার করেছিলেন কেন

আপনারা জানেন, বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য বিদ্যাসাগরকে সেদিন কত সংগ্রাম করতে হয়েছে সমগ্র হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে। ধর্মে অবিশ্বাসী হয়েও এই সংগ্রামে তিনি ধর্মশাস্ত্রকে ব্যবহার করেছিলেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন, শুধু

যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে এবং আইন পাশ করে এদেশে বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করা যাবে না। ফলে যা কিছু পরিবর্তন করতে হবে, ধর্মশাস্ত্রকে ব্যাখ্যা করার সুযোগ নিয়ে বুঝিয়ে করতে হবে। বিদ্যাসাগরের নিজস্ব ব্যাখ্যা আমি এখানে পড়ছি, কারণ একদল তথাকথিত মার্কসবাদী নিজেদের অজ্ঞতার জন্য বিদ্যাসাগর সম্পর্কে এ বিষয়ে ভ্রান্ত সমালোচনা করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন যে, যিনি ধর্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধে বলেছেন, তিনি কেন বিধবা বিবাহের পক্ষে শাস্ত্র ব্যাখ্যার আশ্রয় নিলেন? এর উত্তর আমাদের দেওয়ার প্রয়োজন নেই, তাঁর নিজের বক্তব্য উল্লেখ করাই যথেষ্ট। তিনি বলছেন, "যদি যুক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া ইহাকে কর্তব্যকর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে এতদ্দেশীয় লোকে কখনই ইহা কর্তব্যকর্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্তব্যকর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই তাহারা কর্তব্যকর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে এবং তদনুসারে চলিতে পারেন। এরূপ বিষয়ে এদেশের শাস্ত্রই সর্বপ্রধান প্রমাণ, এবং শাস্ত্রসম্মত কর্মই সর্বতোভাবে কর্তব্যকর্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। অতএব বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম, ইহার মীমাংসা করাই সর্বাগ্রে আবশ্যক।"[১] এই বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়, বিদ্যাসাগর কত কঠোর বাস্তববাদী ছিলেন। এজন্যই বিধবাবিবাহকে শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করার জন্য বিদ্যাসাগর দীর্ঘদিন দিনরাত সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ তন্নতন্ন করে পড়েছেন। এত সময় দিয়ে এসব তাঁকে পড়তে হয়েছিল যে, বহুদিন তাঁর খাওয়াদাওয়া এবং ঘুমানো পর্যন্ত প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি তারপর দেখলেন, শাস্ত্রে চারটি সংহিতা — সত্যযুগের জন্য মনুসংহিতা, ত্রেতাযুগের জন্য গৌতমসংহিতা, দ্বাপরযুগের জন্য শঙ্করসংহিতা, আর কলিযুগের জন্য পরাশরসংহিতা আছে। সব পড়ার পর দেখলেন, পরাশরসংহিতাতে বিধবাবিবাহের বিধান আছে। যখন বিধবাবিবাহের কথা বললেন, তখন সকলেই খেপে গিয়ে বলল, এটা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। শোভাবাজার রাজবাড়িতে বৈঠক হল, দেশের সব বাঘা বাঘা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা হাজির হয়েছেন। বিদ্যাসাগর পরাশরসংহিতা দেখিয়ে প্রমাণ করে দিলেন, শাস্ত্রে বিধবাবিবাহের বিধান আছে। তখন কেউ আর কিছু বলতে পারে না শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে। শাস্ত্রবিচারে পরাস্ত হয়ে শেষপর্যন্ত পণ্ডিতকুল বললেন, বিধবাবিবাহ 'লোকাচারে' চলে না। যাঁরা এতদিন 'শাস্ত্র' 'শাস্ত্র' করে গলা ফাটাচ্ছিলেন, এখন তাঁরাই শাস্ত্র ছেড়ে 'লোকাচারকে' হাতিয়ার করে ফেললেন। অবশ্য কোণঠাসা হয়ে এছাড়া তাঁদের অন্য কোনও উপায়ও ছিল না। উত্তরে বিদ্যাসাগর যা বলেছেন, দরদী মন নিয়ে পড়লে চোখে জল এসে যায়। বলেছেন "তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত

ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানতাদোষে সংসারতরু কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছে। হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকতা রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।"[২] তিনি বলেছেন, "দুর্ভাগ্যক্রমে যাহারা অল্প বয়সে বিধবা হয়, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, এবং বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে, ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যার স্রোত যে উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে, ইহা বোধ করি, চক্ষুকর্ণবিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।"[৩] কী গভীর মর্মবেদনা নিয়েই না তিনি এ কথাগুলি বলেছিলেন এবং এই অতি হৃদয়বিদারক নিষ্ঠুর বাস্তব সঙ্কটের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। অথচ দীর্ঘদিন ধরে ধর্ম ও লোকাচারের নামে এসবই এদেশে চলছিল। এছাড়া তাঁর আরেকটি ঐতিহাসিক উক্তিও স্মরণীয়। নিজে মার্কসবাদের সংস্পর্শে না এসেও এবং এ সম্পর্কে কোনও ধারণা না থাকা সত্ত্বেও তিনি বিস্ময়করভাবে মার্কসবাদ ও ইতিহাস-স্বীকৃত একটি সত্য উদ্‌ঘাটন করে বলেছিলেন, "স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও সামাজিক নিয়মদোষে পুরুষজাতির নিতান্ত অধীন।"[১] নারী যে পুরুষের অধীন, এটা যে শাশ্বত ও চিরন্তন নয়, সামাজিক নিয়ম দোষেই এটা ঘটেছে, সেই যুগে এসত্য উপলব্ধি করা ও এভাবে ব্যক্ত করা কত বড় অসাধারণ চিন্তাশীল মনের প্রকাশ, তা একবার ভেবে দেখুন। পরবর্তীকালে একমাত্র শরৎচন্দ্রই এই অভিমত বলিষ্ঠভাবে বলেছিলেন।

'মার্কসবাদী' পণ্ডিতদের সমালোচনায় মার্কসীয় বিচারধারাই নেই

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে এদেশের তথাকথিত মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের কিছু সমালোচনা আছে, যার মধ্যে মার্কসবাদী বিচারধারার লেশমাত্র নেই। আমি আগেই বলেছি, মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষের বিচারধারা ও শিক্ষা অনুযায়ী আমি যেমন করে বিদ্যাসাগরকে বুঝেছি, সেইভাবেই আমার বক্তব্য রাখছি। এই বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে শ্রী বিনয় ঘোষের নামই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনি একসময় বিদ্যাসাগর সম্পর্কে গবেষণা করে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে বক্তব্য রাখেন। সেইগুলি নিয়ে 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের উপসংহারে বিদ্যাসাগরের 'সীমাবদ্ধতা, ব্যর্থতা ও অসংগতি' নামে একটি অধ্যায় তিনি পরবর্তীকালে যুক্ত করেন। তাঁর পূর্বে একই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী শ্রী গোপাল হালদারও কিছুটা এবং

পরবর্তীকালে আরও কয়েকজন অনেকটা এই ধরনের বক্তব্যই রেখেছেন। এঁদের মধ্যে যেহেতু শ্রী বিনয় ঘোষের বক্তব্যই সবচেয়ে জোরালো, সেইজন্য তাঁর বক্তব্য উল্লেখ করেই আলোচনা করছি। তিনি একদিকে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বলছেন, "তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন না এমন কথা বলা যায় না, তবে তিনি যে একেশ্বরবাদী ছিলেন এবং তাঁর ধর্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরবিশ্বাস একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।"‡ অর্থাৎ বিনয় ঘোষের মতে বিদ্যাসাগর 'ঈশ্বরবিশ্বাসী', 'একেশ্বরবাদী' ছিলেন এবং এই বিশ্বাস তাঁর 'ব্যক্তিগত' ব্যাপার ছিল। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, একই পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ বিপরীত বক্তব্য তিনি লিখেছেন। তিনি বলছেন, "বিদ্যাসাগরের চরিত্রের অত্যাশ্চর্য অসংগতি দেখা যায় তাঁর মূল জীবনদর্শনের মধ্যে। প্রচলিত ধর্ম (রিলিজিয়ন) ও অধ্যাত্মবাদী দর্শনের প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাবের কোনো পরিবর্তন, তাঁর বার্ধক্য ও ব্যর্থতার জন্য জীবনের শেষদিন পর্যন্ত হয়নি। ... দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রত্যয়ের দিক থেকে বিদ্যাসাগরকে বস্তুবাদী (মেটিরিয়ালিস্ট) ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।"‡ একই ব্যক্তি, একই রচনায় কীভাবে বিদ্যাসাগরকে একইসঙ্গে 'ঈশ্বরবিশ্বাসী' এবং 'বস্তুবাদী' বলে চিহ্নিত করতে পারলেন? এ জিনিস সত্যিই আশ্চর্যজনক। তাঁদের মতো মার্কসবাদী পণ্ডিতদের পক্ষেই বোধহয় একমাত্র এভাবে লেখা সম্ভব!

আর এক জায়গায় বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তিনি লিখছেন, 'পাশ্চাত্য ও ভারতীয় বিদ্যার সমন্বয় তাঁর কাম্য ছিল।' এটাও সঠিক নয়। দুই দেশের বিদ্যার সমন্বয় তিনি চাননি, বরং বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, ভারতীয় বিদ্যা নয়, শুধুমাত্র বাংলা ও এদেশীয় ভাষার বিকাশের জন্য সংস্কৃত ভাষার চর্চা হোক, আর পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা হোক।

ব্রিটিশ সরকারের 'গণশিক্ষা' ও অন্যান্য পরিকল্পনা সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মতামতকে অপব্যাখ্যা করা হয়েছে

তাঁর সম্পর্কে অভিযোগ করা হয়েছে যে, তিনি ব্রিটিশ সরকারের গণশিক্ষা পরিকল্পনার (মাস এডুকেশন স্কিম)-এর বিরোধিতা করেছিলেন, তিনি শিক্ষাকে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। এ অভিযোগ আদৌ ঠিক নয়। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, "শুধু 'রিডিং, রাইটিং, অ্যারিথমেটিক' শেখানো যথার্থ শিক্ষার প্রসার নয়, ছাত্রদের 'কম্প্রিহেনসিভ' বা সামগ্রিক শিক্ষা দিতে হবে।"† দেশে যতটুকু এই সামগ্রিক শিক্ষা-র সীমাবদ্ধ সুযোগ চালু আছে, তার ব্যয়বরাদ্দ কমিয়ে ও এই শিক্ষাকে সংকুচিত করে গণশিক্ষা প্রবর্তনের নামে শুধু 'রিডিং, রাইটিং, অ্যারিথমেটিক' শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে তিনি আপত্তি করেছিলেন। তাঁর একান্ত কামনা ছিল, আগে একদল ছাত্র ইউরোপের উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করে ধর্মীয় ও

ঐতিহ্যবাদের কূপমণ্ডুকতা থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত মানুষ হবে এবং পরে তারাই শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব নিয়ে দেশকে অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে পারবে। ইতিপূর্বে তিনি দেখেছিলেন, সরকার সাহায্য দেবে এই প্রতিশ্রুতিতে তিনি যে গ্রামে গ্রামে বহু স্কুল স্থাপন করেছিলেন, আর্থিক সঙ্কটের দোহাই দিয়ে সরকারি সাহায্য না দেওয়ায় সেগুলি শেষপর্যন্ত বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। ফলে এক্ষেত্রেও তাই ঘটবে, তাঁর এই আশঙ্কা অমূলক ছিল না। এই পরিণাম পরবর্তীকালে ঘটেছেও। এই প্রশ্নে বিদ্যাসাগরের বক্তব্য আপনাদের শোনাই। দেখুন, তিনি বলছেন, "সমগ্র জনসাধারণকে শিক্ষিত করা অবশ্যই আকাঙ্ক্ষিত জিনিস।" তারপরই বলছেন, "একথা উল্লেখ করা যায় যে, ইংল্যান্ডের সভ্যতার অগ্রগতি ঘটলেও শিক্ষার প্রশ্নে সে দেশের জনগণ তাদের ভারতীয় ভ্রাতাদের চেয়ে আদৌ উন্নত নয়।"[১] অর্থাৎ তিনি পরিষ্কার দেখিয়ে দিলেন, যে ব্রিটিশ সরকার এদেশে গণশিক্ষা চালুর জন্য এত কথা বলছে, তারা এদেশ থেকে অনেক অগ্রসর হয়েও এখনও পর্যন্ত নিজ দেশেই এই শিক্ষা চালু করতে পারেনি। ফলে এদেশে গণশিক্ষা তো চালু হবেই না, মাঝখান থেকে উচ্চশিক্ষার যৎসামান্য যে সুযোগ আছে, তাও বন্ধ হয়ে যাবে। এরপর তিনি বললেন, "গণশিক্ষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাই যদি সরকারের ভাবনা হয়, তবে সেই শিক্ষা অবশ্যই বিনামূল্যে দিতে হবে, কোনও চার্জ নেওয়া চলবে না।" এরপর তিনি বললেন, "সরকার শুধু যদি রিডিং, রাইটিং ও সামান্য অ্যারিথমেটিক শেখাবার মধ্যেই সামগ্রিক শিক্ষাদানকে সীমাবদ্ধ রাখে, তবে তা দেশের বর্তমান অবস্থায় অকার্যকরী হবে বলে মনে হয়... এর দ্বারা সামগ্রিক শিক্ষা হবে না, শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে হলে ভূগোল, ইতিহাস, জীবনী, অ্যারিথমেটিক, জ্যামিতি, প্রাকৃতিক দর্শন, নৈতিক দর্শন, পলিটিক্যাল ইকনমি, ফিজিওলজি পড়ানো দরকার। ... একশত ছাত্রকে নিছক রিডিং ও অ্যারিথমেটিক শেখানোর চেয়ে সরকার যদি একজন ছাত্রকেও উপযুক্ত পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে, তবে জনগণকে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশি কাজ করা হবে।"[১] এরপর কি বলা চলে, বিদ্যাসাগর শুধু বিত্তবানদের জন্য শিক্ষা চেয়েছিলেন এবং গণশিক্ষার বিরোধী ছিলেন?

এও অভিযোগ করা হয়েছে যে, তিনি কুসংস্কার মনস্কতার জন্য সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাড়া অন্যদের ভর্তি করার বিরুদ্ধে ছিলেন। এটাও ঠিক নয়। আগেই বলেছি, তিনি চেয়েছিলেন, সামান্য হলেও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার যতটুকু সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে সেটা অব্যাহত থাকুক। কারণ এই শিক্ষার অধিকারী হতে পারলে এই ছাত্ররাই সমাজে ধর্মীয় চিন্তা, ধর্মান্ধতা, জাতপাতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শক্তি হবে এবং দেশে শিক্ষাবিস্তারে উদ্যোগী হবে। কিন্তু সেই সময়ে কিছু বিত্তবান উচ্চবর্ণের ছেলেরাই শুধু পড়তে আসত এবং পরিবারগুলো

খুবই গোঁড়া ছিল। সকল বর্ণের ছাত্রদের ভর্তির সুযোগ দিলে এই পরিবারগুলি ছেলেদের পাঠাবে না, তার ফলে এই সীমাবদ্ধ শিক্ষাদানের সুযোগও বন্ধ হয়ে যাবে, কারণ গরিব নিম্নবর্গের ছেলেরা আর্থিক কারণেই এই সুযোগ নিতে পারবে না। তাই তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিতান্ত বাধ্য হয়েই তাঁকে এটা মানতে হয়। এই সম্পর্কে নিজের চিন্তা ব্যক্ত করে তিনি বলেছিলেন, "ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাড়াও অন্যান্য বর্ণের ছাত্রদের অর্থাৎ শূদ্রদের সংস্কৃত কলেজে প্রবেশে আমি কোনও আপত্তি দেখি না। কিন্তু অ্যাজ এ মেজার অফ এক্সপিডিয়েন্সি (অর্থাৎ বর্তমান সময় অনুযায়ী সুবিধাজনক ব্যবস্থা হিসাবে) আমার প্রস্তাব হচ্ছে, বর্তমানে শুধু কায়স্থদের ভর্তি করা হোক।"† লক্ষ করুন এখানেও তাঁর চিন্তা পরিষ্কারভাবেই রেখে বলেছেন যে, 'সুবিধাজনক ব্যবস্থা হিসাবে বর্তমানে' কায়স্থ ছাড়া বাকিদের ভর্তি করানো ঠিক হবে না। অর্থাৎ বর্তমানে নয়, পরিস্থিতির পরিবর্তনের পর ভবিষ্যতে করা যাবে। সুতরাং তাঁর যে কোনও কুসংস্কার ছিল না একথা পরিষ্কার। তৎকালীন শিক্ষা বিস্তারের স্বার্থেই তিনি একথা বলেছিলেন। অথচ এই সব বিচার না করেই কিছু বুদ্ধিজীবী তাঁর বিরুদ্ধে অবান্তর অভিযোগই তুলেছেন। এইসব বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধির যথার্থই তারিফ করতে হয়!

তাঁরা অভিযোগ করেছেন যে, ব্রিটিশ সরকার নিযুক্ত মিস কার্পেন্টার দেশীয় মহিলা শিক্ষক তৈরি করার উদ্দেশ্যে মেয়েদের জন্য নর্মাল বিদ্যালয় স্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর তাতে সহযোগিতা করেননি। এটা তাঁদের মতে বিদ্যাসাগরের শিক্ষা নিয়ে চিন্তার মধ্যে স্ববিরোধিতার প্রকাশ। কিন্তু বাস্তবে তাঁর কোনও স্ববিরোধিতা ছিল না। তিনি কঠোর বাস্তব পরিস্থিতি লক্ষ করে বুঝেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, মহিলা শিক্ষকের ট্রেনিং নেওয়ার জন্য এদেশীয় কোনও কুমারী, সধবা বা বিধবা মহিলা পাওয়া যাবে না। তাই বলেছিলেন, "আমার দেশবাসীর সামাজিক কুসংস্কার যদি এক্ষেত্রে অলঙ্ঘ্য বাধা না হত, তবে আমিই সর্বপ্রথম এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতাম।"[১] বাস্তবে ঘটেছেও তাই। সরকার প্রতিষ্ঠিত মহিলা নর্মাল বিদ্যালয়ে কোনও ছাত্রী পাওয়া যায়নি। বিদ্যাসাগরের এই বক্তব্যের মধ্যে স্ববিরোধিতার সন্ধান পাওয়া কষ্টকল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। তাঁরা আরও অভিযোগ করেছেন যে, শেষজীবনে সহবাস-সম্মতি আইনের প্রশ্নে তিনি যে মতামত প্রকাশ করেছিলেন, তার মধ্যেও ত্রুটি অসঙ্গতি পাওয়া যায়। একথা সত্য নয় যে, তিনি এই আইনের বিরুদ্ধতা করেছিলেন, বরং প্রয়োজনীয়তার পক্ষেই সওয়াল করে বলেছিলেন, "আমি মনে করি, একজন মহিলার জীবনে প্রথম ঋতুস্রাবের পূর্বে তার সাথে বিবাহজনিত যৌন মিলনে লিপ্ত হওয়া একজন পুরুষের ক্ষেত্রে অপরাধ...।" আবার একই ভাবে সতর্ক করে বলেছিলেন, "আমি মনে করি বালিকাবধূদের উপযুক্ত রক্ষাকবচের মতো কিছু

যুক্ত করেই এই আইন রচনা এমনভাবে করা উচিত যাতে তা কোনও ধর্মীয় আচারের সাথে বিরোধের কারণ না হয়।" আপনারাই বিচার করে দেখুন, এই বক্তব্যের মধ্যে তাঁর চিন্তার 'অসঙ্গতি' কী করে খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য যখন সংগ্রাম শুরু করেছিলেন, তখনই বলেছেন, শুধু যুক্তি দিয়ে এবং আইন করেও কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশবাসীকে দিয়ে তা মানানো যাবে না, যদি না বিধবা বিবাহকে শাস্ত্রসিদ্ধ প্রমাণ করা যায়। তাই তিনি পরাশর সংহিতার শ্লোক খুঁজে বের করে ব্যবহার করেছিলেন। যদিও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা শাস্ত্রের লড়াইয়ে দাঁড়াতে না পেরে শেষে লোকাচারের দোহাই দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন, আইনটা এমনভাবে করতে হবে যাতে কোনও ধর্মীয় আচারের সাথে তার বিরোধের কারণ না ঘটে। তা না হলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশের মানুষ মানবে না। এর মধ্যে অসঙ্গতি কোথায়? বাস্তববাদী হিসাবে প্রথম থেকেই তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলেছেন, আবার অন্যদিকে সেক্যুলার এডুকেশন প্রবর্তনের মাধ্যমে জনগণকে অধ্যাত্মবাদী, ধর্মীয় চিন্তা থেকে মুক্ত করে বিজ্ঞানমুখী, যুক্তিবাদী হিসাবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন। আমাকে বলতেই হচ্ছে, শ্রী বিনয় ঘোষের ইনটেলেকট এসব বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে।

শ্রীবিনয় ঘোষদের বিদ্যাসাগর সম্পর্কে অভিযোগ ও মূল্যায়ন সম্পূর্ণ মার্কসবাদবিরোধী

আমাকে আরও দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, বিনয়বাবুরা এদেশের মার্কসবাদ বিচ্যুত তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টিগুলির চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হয়ে এই মহান চরিত্রের মূল্যায়নের নামে কিছু মারাত্মক অন্যায়ও করেছেন। তিনি বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বলেছেন, "সভাসমিতির প্রগতিশীল আদর্শ তাঁকে সবসময় যে আকর্ষণ করত তা নয়। তা যদি করত তাহলে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা', 'সুহৃদ সমিতি' এবং ব্রাহ্ম ও ক্রিশ্চান ও অন্যান্য আরও অনেক সমাজসংস্কারব্রতী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকতেন। কিন্তু তার আপসহীন প্রখর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ অধিকাংশ সভাসমিতির সঙ্গে এই সম্পর্ক স্থাপনের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।"‡ এখানেই না থেমে বিনয় ঘোষ আরও অভিযোগ করেছেন, "এরকম আত্মপ্রাধান্যকারী চরিত্র, জিদ ও একগুঁয়েমি এবং ভালোমন্দ সম্বন্ধে চরম ধারণা নিয়ে কোনও যৌথ প্রতিষ্ঠান, ইনস্টিটিউশন বা সভাসমিতি পরিচালনা করা যায় না।"‡ বিনয় ঘোষ এই তথ্য কোথা থেকে পেয়েছেন তা আমাদের জানা নেই। বরং দেখা যায়, সেই সময়ে এমন কোনও প্রগতিশীল আন্দোলন বা মহৎ কর্মকাণ্ড ছিল না, যার সাথে বিদ্যাসাগর প্রত্যক্ষ বা

পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন না। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে নীতিগত কারণেই ধর্মীয় আলোচনাসভা এবং ধর্মভিত্তিক সমাজসংস্কারব্রতী প্রতিষ্ঠানের সাথে তিনি যুক্ত থাকেননি। ঘরে-বাইরে সারা জীবন নীতি-আদর্শগত প্রশ্নে তিনি কোথাও এতটুকু আপস করেননি, কোনও অন্যায়কে প্রশ্রয়ও দেননি। যে প্রতিষ্ঠানে যুক্ত থাকতেন, সেখানেও কোনও অন্যায় দেখা দিলে সম্পর্ক ছিন্ন করতেন। এ ব্যাপারে খুবই দৃঢ় ছিলেন। আত্মপ্রাধান্যকামিতা নয়, সবসময় সর্বক্ষেত্রে ন্যায় ও সত্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সচেষ্ট থাকতেন। এইসব মহৎ গুণকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করার পরিবর্তে বিনয়বাবুরা বিদ্যাসাগরের চরিত্রের মধ্যে 'আত্মপ্রাধান্যকারী চরিত্র, জিদ ও একগুঁয়েমি' আবিষ্কার করেছেন। কী বিচিত্র মার্কসবাদী বিশ্লেষণ! এই বিচিত্র মার্কসবাদী জ্ঞান আরও প্রকট হয়ে দেখা দেয়, যখন বিনয় ঘোষ বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বলেন, "জীবনের শেষদিনগুলিতে নির্বাসিতের মতো তিনি হতাশা ও বিষন্নতার অন্ধকারে কাটিয়েছিলেন।"‡ এর কারণ আবিষ্কার করে তিনি বলেছেন, "সামাজিক সংগ্রামে বিদ্যাসাগরের ব্যর্থতার প্রধান কারণ হল স্বশ্রেণীর, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে তাঁর সংগ্রামক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা, এবং তাও মধ্যবিত্তের সর্বস্তরের মধ্যে নয়, শহরকেন্দ্রিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে"।‡

বিদ্যাসাগর 'হতাশা এবং বিষণ্ণতার অন্ধকারে' কাটিয়েছিলেন, এটা প্রমাণ করার অতি ব্যগ্রতায় বিনয় ঘোষ শেষজীবনে বিদ্যাসাগর লিখিত একটি চিঠির মূল অংশ বাদ দিয়ে উপসংহার থেকে কিছু কথা বিচ্ছিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন। বিনয়বাবু বর্ণিত উল্লেখিত অংশ হচ্ছে, "আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে, আমি কখনোই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না। তৎকালে সকলে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে আমি সাহস করিয়া এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, নতুবা বিবাহ ও আইনপ্রচার পর্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকিতাম। দেশহিতৈষী সৎ কর্মোৎসাহী মহাশয়দিগের কথাকে বিশ্বাস করিয়া ধনেপ্রাণে মারা পড়িলাম। অর্থ দিয়া সাহায্য করা দূরে থাকুক, কেহ ভুলিয়া এবিষয়ে সংবাদ লয়েন না।"‡ এই চিঠির প্রথম দিকের যে মূল অংশ বিনয়বাবু বাদ দিয়েছেন, সেটা এবার আপনাদের শোনাচ্ছি। সেখানে বিদ্যাসাগর লিখছেন, "তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ, আমি নিজ প্রয়োজনের নিমিত্ত তোমার কাগজ লই নাই। বিধবা বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে লইয়াছিলাম। কেবল তোমার নিকট নহে, অন্যান্য লোকের নিকট হইতেও লইয়াছি। এ সকল কাগজ এই ভরসায় লইয়াছিলাম যে, বিধবাবিবাহ পক্ষীয় ব্যক্তিরা যে সাহায্যদান অঙ্গীকার করিয়াছেন, তদ্দারা অনায়াসে শোধ করিতে পারিব। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই অঙ্গীকার সাহায্যদানে পরান্মুখ হইয়াছেন। উত্তরোত্তর এ বিষয়ের ব্যয়বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু আয় ক্রমে খর্ব হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং আমি বিপদগ্রস্ত হইয়া

পড়িয়াছি। সেই সকল ব্যক্তি অঙ্গীকার প্রতিপালন করিলে আমাকে এইরূপ সঙ্কটে পড়িতে হইত না। কেহ মাসিক, কেহ এককালীন, কেহ বা উভয় এইরূপ নিয়মে অনেকে দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ কারণ দেখাইয়া, কেহ বা তাহা না করিয়াও দিতেছে না। অন্যান্য ব্যক্তিদের ন্যায় তুমিও মাসিক ও এককালীন সাহায্যদানে স্বাক্ষর কর। এককালীনের অর্দ্ধমাত্র দিয়াছ, অবশিষ্টার্দ্ধ এ পর্যন্ত দাও নাই এবং কিছুদিন মাসিক দান রহিত করিয়াছ। ... তবে তোমার প্রয়োজনের সময়ে তোমাকে তোমার কাগজ দিতে পারিলাম না। এজন্য অতিশয় দুঃখিত হইতেছি।”‡ এই চিঠিটা পড়লে কি মনে হয়, বিদ্যাসাগর জীবনের শেষদিনগুলি নির্বাসিতের মতো হতাশা ও বিষণ্ণতার অন্ধকারে কাটিয়েছিলেন? এই চিঠিটি তিনি অতি দুঃখে লিখেছিলেন তাঁর বন্ধু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে, যাঁর থেকে কাগজ নিয়ে বিদ্যাসাগর টাকা ধার করেছিলেন এবং যিনি বারবার কাগজ ফেরত দেওয়ার জন্য তাগাদা দিচ্ছিলেন। এই চিঠি পড়লেই বোঝা যায়, কী বিপুল পরিমাণে ঋণগ্রস্ত হয়ে এবং পাওনাদারদের ক্রমাগত তাগাদায় বিপর্যস্ত হয়ে ব্যথা ও অভিমানে এই চিঠি তিনি লিখেছিলেন এমন একজন বন্ধুকে, যিনিও বিধবাবিবাহে সাহায্যদানের অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করেও আংশিকমাত্র দিয়ে বাকিটা দেওয়া বন্ধ রেখে কাগজ দেওয়ার জন্য তাগাদা দিচ্ছিলেন। ইতিপূর্বে বিদ্যাসাগর মাইকেল মধুসূদনকে সাহায্য করার জন্যও বিপুলভাবে ঋণগ্রস্ত হয়েছিলেন, তারপর অনেক কষ্টে তা শোধ করেন। বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠানগুলির জন্যও তাঁকে বিপুল অর্থব্যয় করতে হয়েছিল। কারণ প্রায় অধিকাংশ বিয়েই পাত্রপক্ষের বাড়ির অমতে হয়েছিল এবং বহু পাত্রীর বাড়ির দারিদ্র্য ছিল, তাই এসব বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যয় তিনি বহন করতেন। যাঁরা এই আন্দোলনের সমর্থনে ছিলেন তাঁরা সাহায্য দেবেন, এই প্রতিশ্রুতিতে তিনি ব্যাপক ঋণও করেছিলেন। কিন্তু এঁরা অনেকেই সাহায্য না দেওয়ায় তিনি বিপন্ন হয়ে পড়েন। পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে, বিদ্যাসাগর যখন কলকাতার বাইরে, তাঁর কয়েকজন বন্ধু তাঁকে না জানিয়ে তাঁকে ঋণমুক্ত করতে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। এ খবর শুনে অসন্তুষ্ট হয়ে বিদ্যাসাগর সংবাদপত্রে জনসাধারণের উদ্দেশে যে কথাগুলি বলেছিলেন, সেটাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ও শিক্ষণীয়। আপনাদের তা শোনাচ্ছি। তিনি বলেছেন, “আমার সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে কে কী বলল বা ভাবল তা আমি গ্রাহ্য করি না। কিন্তু যদি আমি দেখি কারও কোনও প্রচেষ্টায়, তার পিছনে যত সৎ উদ্দেশ্য থাকুক না কেন, আমার আদর্শ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তবে অত্যন্ত দুঃখ পাই। যারা চাঁদা চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তাঁরা যদি বিধবা বিবাহ তহবিলের জন্য চাঁদা চাওয়ার মধ্যেই আবদ্ধ থাকতেন, আমার ঋণগ্রস্ততার কথা না বলতেন, তাহলে এ ধরনের উদ্যোগের বিরুদ্ধে এত তীব্র

প্রতিবাদ জানানোর প্রয়োজন আমি বোধ করতাম না। আমার ব্যক্তিগত দায়ভার মেটানোর জন্য জনগণের কাছে আবেদন জানানোর কথা ভাবতেও পারি না। অথচ এই বিজ্ঞাপনে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে এতটাই জড়ানো হয়েছে যে প্রতিবাদ করতেই হবে। যে ভদ্রমহোদয়রা এই উদ্যোগ নিয়েছেন, তাঁদের বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করছি।'[১] এই বক্তব্য থেকেও পরিষ্কার যে, তিনি একথা জেনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হয়েছিলেন যে, তিনি যে কারণে ঋণগ্রস্ত হয়েছিলেন সেই বিধবাবিবাহ সাহায্য তহবিলে সাহায্য না করে এঁরা ব্যক্তি হিসাবে তাঁকে ঋণমুক্ত করার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি কোনও দিন কারোর কাছে হাত পাতেননি এবং তাঁর গুণগ্রাহী কোনও ধনী, ব্যবসায়ী, জমিদার বা রাজাদের কাছ থেকে দানও গ্রহণ করেননি।

বিদ্যাসাগর চলার পথে প্রতিক্রিয়াশীল, সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণায় আচ্ছন্ন ধর্মান্ধদের কাছ থেকে প্রচণ্ড বাধা পেয়েছেন তাই নয়, এমনকী প্রথম দিকে যাঁরা সমর্থন করেছিলেন তাঁদেরও অনেকে পরে পিছিয়ে গেছেন, চাঁদা দেবেন বলে অঙ্গীকার করেও চাঁদা দেননি। রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র বিদ্যাসাগরের বন্ধু রমাপ্রসাদ রায় যখন বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা দিয়েও শেষমুহূর্তে বলেন, 'আমি তোমার সাথে আছি, কিন্তু যেতে পারব না'; ক্রুদ্ধ বিদ্যাসাগর তাঁকে দেওয়ালে টাঙানো রামমোহনের ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন, 'ঐ ছবি ফেলে দাও, ওটা রাখার তোমার কোনও অধিকার নেই'। বিধবাবিবাহ প্রবর্তন ও বহুবিবাহ বন্ধ করার প্রশ্নে এমনকী একদল শিক্ষিত অথচ রক্ষণশীল মানুষ শুধু বিরুদ্ধতাই নয়, বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কটূক্তিও করেছেন। যেমন তাঁর বয়োঃকনিষ্ঠ ও স্নেহধন্য উদীয়মান সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষে' লিখেছেন, "ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে নাকি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?" বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' বহুবিবাহ প্রশ্নে বিদ্যাসাগরের বক্তব্য সম্পর্কে শ্লেষাত্মক মন্তব্যও করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই এগুলি তাঁকে ব্যথা দিয়েছিল। আরও ব্যথা পেয়েছেন যখন জানতে পারতেন, বিধবা নারীকে বিবাহের পর কোথাও কোথাও স্বামী গঞ্জনা দিচ্ছে, অপমান করছে, কোথাও কোথাও বাড়ির চাপে বা নিজের থেকে স্ত্রীকে ত্যাগ করে পুনরায় বিয়ে করছে। অন্যদিকে পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে অনেককেই তিনি বিপদে সাহায্য করেছেন, তাদের মধ্যে বেশ কিছু জন পরবর্তীকালে তাঁর নিন্দা করেছে — যার জন্য কোনও একজন নিন্দা করছে শুনে দুঃখ করে তিনি বলেছিলেন, 'রও, ভেবে দেখি, সে আমার নিন্দে করবে কেন? আমি তো কখনো তার কোন উপকার করিনি।'† অকৃতজ্ঞদের কাছ থেকে কতটা আঘাত পেলে এভাবে বলতে পারেন! এরকম বহু আঘাতে তিনি যখন খুবই

ব্যথিত সেই সময়েই তিনি বন্ধু দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে উত্তর দিয়ে উপরোক্ত কথা বলেছিলেন, আর সেই উত্তর থেকেই বিনয় ঘোষরা এই ধরনের সিদ্ধান্ত করেছেন। সত্যিই তাঁদের বুদ্ধি এবং বিচার ক্ষমতার তারিফ করতে হয়! এছাড়া আর কী বলতে পারি, আপনারা ভেবে দেখবেন।

এতদ্‌সত্ত্বেও 'হতাশা ও বিষণ্ণতা' এই মহান চরিত্রকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি একথা আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি। তিনি শেষদিন পর্যন্ত তাঁর আদর্শ ও লক্ষ্য অনুযায়ী অক্লান্ত সংগ্রাম করে গিয়েছেন, যদিও কঠিন ব্যাধি শেষজীবনে তাঁর কাজে প্রায়ই ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। এই সময়ে যাঁরা ভালো কাজ করতে গিয়ে বাধা পেয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে তাঁকে জানিয়েছিলেন, তাঁদেরকে বিদ্যাসাগর যে উত্তর দিয়েছিলেন, সেটাও উল্লেখযোগ্য। দুর্গামোহন দাস নামে জনৈক হাইকোর্টের উকিল তাঁর বালবিধবা বিমাতার বিবাহের উদ্যোগ নিয়ে প্রথমবার বাধা পেয়ে ব্যর্থ হয়ে বিদ্যাসাগরকে হতাশা ব্যক্ত করে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। তার যে উত্তর তিনি দিয়েছেন, সেটাও এক অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে। তিনি লিখেছেন, "... যাহাদের অভিপ্রায় সৎ ও প্রশংসনীয় এরূপ লোক অতি বিরল এবং শুভ ও শ্রেয়স্কর বিষয়ে বাধা ও ব্যাঘাত জন্মাইবার লোক সহস্র সহস্র। ... এমন অবস্থায় চেষ্টা করিয়া যতদূর কৃতকার্য হইতে পারা যায় তাহাতেই সৌভাগ্য জ্ঞান করিতে হয়। এবিষয় সম্পন্ন হইলে আমি আপনাকে যেরূপ শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করিতাম, এরূপ ব্যাঘাত ঘটাতেও সেইরূপ করিব।"† আরেকজন ব্যক্তিও যখন নানা কুৎসায় ও বাধায় গভীর হতাশায় এ কাজ থেকে বিরত হতে চাইছিলেন, তখন তাঁকেও ভর্ৎসনা করে বিদ্যাসাগর বুঝিয়েছিলেন, "সৎ কাজ করিবার সময় লোকের নিন্দাকে, লোকের কথাকে ভুলিতে না পারিলে এ পথে যাওয়া ঘোরতর অন্যায়। আমাকে লোকেরা এতদূর নীচ কথা পর্যন্ত বলিয়া সময়ে সময়ে গালি দিয়াছে যে, আমি চরিত্রহীন বলিয়া অল্পবয়স্কা বিধবাদের বাড়িতে আশ্রয় দিই।"† জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছেও যিনি একথা বলতে পারেন, তাঁর সম্পর্কে কি বলা চলে যে, জীবনের শেষ দিনগুলিতে নির্বাসিতের মতো তিনি হতাশা ও বিষণ্ণতার অন্ধকারে কাটিয়েছিলেন?

তাঁর তীব্র সংগ্রামবহুল সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি আগামীদিনের জন্য এক ঐতিহাসিক শিক্ষা জীবনের সায়াহ্নকালে ব্যক্ত করে বলেছিলেন, "এদেশের উদ্ধার হইতে বহু বিলম্ব আছে। পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাত পুরু মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নূতন মানুষের চাষ করিতে পারিলে, তবে এদেশের ভাল হয়।"† অর্থাৎ দীর্ঘদিন ধরে ধর্মীয় শাস্ত্রভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক তমসাচ্ছন্ন ভাবধারায় শিক্ষার ফলে মানুষের যে প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি গড়ে উঠেছে, তার 'চাষ' অর্থাৎ সেই শিক্ষাদানকে প্রথম বন্ধ করতে

হবে। তারপর 'সাত পুরু মাটি' তুলে ফেলে, অর্থাৎ সমাজের স্তরে স্তরে ঐ শিক্ষার প্রভাবে যে ক্লেদ জমেছে তাকে পরিষ্কার করতে হবে। তারপর 'নূতন মানুষের চাষ', অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী সেক্যুলার মানবতাবাদী শিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে। এ কাজ করতে অনেক সময় লাগবে। যতক্ষণ হবে না, দেশও উদ্ধার হবে না।

বিনয়বাবুরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, 'সামাজিক সংগ্রামে বিদ্যাসাগর ব্যর্থ' হয়েছেন। এভাবে কি বলা চলে? সেদিন যে মহৎ আন্দোলনের সূচনা তিনি করেছিলেন, তার প্রবাহ তো সে যুগের সীমানা অতিক্রম করে আরও কয়েক যুগ পার হয়ে আজও চলছে। তাঁর জীবদ্দশায় গরিষ্ঠ জনগণের সমর্থন না পাওয়াকে যদি ব্যর্থতা বলতে হয়, তাহলে ইতিহাসে বুদ্ধ, হজরত মহম্মদ, যিশু, রুশো, ভলতেয়ার, মার্কস, এঙ্গেলস সকলেই ব্যর্থ হয়েছিলেন! কোনও যুগেই পুরাতন সমাজ নতুন চিন্তাকে প্রথম দিকে গ্রহণ করতে পারেনি, বরং পদে পদে বাধা দিয়েছে। ইতিহাসের এই কঠিন সত্যকে সেইসব আন্দোলনের ব্যর্থতা বলে না। তাঁদের কল্পিত 'ব্যর্থতার' কারণ হিসাবেও তাঁরা আবিষ্কার করেছেন, 'স্বশ্রেণীর অর্থাৎ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে তাঁর সংগ্রাম ক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা', এবং তাও মধ্যবিত্ত সর্বস্তরের মধ্যে নয়, 'শহরকেন্দ্রিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে।'‡ প্রথমত, বিদ্যাসাগরের সংগ্রামী কর্মক্ষেত্র শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এই অভিযোগ তাঁর অতিবিরোধীরাও কোনও দিন তুলতে পারেনি, বরং শহরের শিক্ষিত বাবুদের একদল যখন ব্রহ্ম ও নানা তত্ত্ব আলোচনায় মগ্ন থাকত, আর এক দল ভোগবিলাসে লিপ্ত থাকত, তখন এই মানুষটি অনেক সময়ই পায়ে হেঁটে দূর থেকে দূরান্তরে গ্রামাঞ্চলে বিধবাবিবাহ প্রবর্তন ও নূতন শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলনের বার্তা নিয়ে যেতেন। আর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ছাড়া তখন কারা এই আন্দোলন করবে? শ্রমিকশ্রেণী? শ্রমিকশ্রেণী তখন কোথায়? শিল্প প্রতিষ্ঠা হলে তো শ্রমিকশ্রেণী আসবে! আর তা না হলে বিনয়বাবুরা কাদের কথা বলছেন? ধর্মান্ধ, সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাভাবনায় আচ্ছন্ন কৃষক সম্প্রদায়ের কথা? এরাই কি শ্রেণীগতভাবে ইউরোপে নবজাগরণের চিন্তাকে ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ঝান্ডাকে তুলে ধরেছিল? ইতিহাস কী বলে? ইতিহাস বলে বণিকী পুঁজির স্তরে নগরের বার্গাররা, অর্থাৎ এদের মধ্যে শহরের শিক্ষিত মহল প্রথম নবজাগরণের চিন্তার উন্মেষ ঘটিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে শিল্পপুঁজির বিকাশের স্বার্থে বুর্জোয়াশ্রেণী থেকে আসা শিক্ষিতরাই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ঝান্ডা তুলে ধরেছিল এবং সার্ফদের, অর্থাৎ ভূমিদাসদের ধর্মান্ধতা থেকে মুক্ত করে এই বিপ্লবে সামিল করেছিল। এমনকী শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের চিন্তাও প্রথম যাঁরা এনেছেন, তাঁরাও তো জন্মগত দিক থেকে শিক্ষিত উচ্চ বা মধ্যবিত্ত পরিবারেরই সন্তান। তাই লেনিন

বলেছেন, "আধুনিক সমাজতন্ত্রের প্রবর্তক মার্কস, এঙ্গেলস নিজেরাই সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন।"[১] ফলে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বিনয়বাবুদের মূল্যায়ন কষ্টকল্পিত ছাড়া কিছুই নয়। বিকৃত মার্কসবাদ চর্চার ফলে এবং শ্রমিক বিপ্লবের যুগে নিজেরাই শহুরে মধ্যবিত্তদের চিন্তা, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার মধ্যে আবদ্ধ থাকার ফলে তাঁরা এইসব ছেলেমানুষী যুক্তি তুলেছেন।

সিপাহি বিদ্রোহের প্রশ্নে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা সম্পর্কে ভ্রান্ত বিচার

তাঁরা সিপাহি বিদ্রোহের প্রশ্নে বিদ্যাসাগরের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। অবশ্য বিদ্যাসাগর হিন্দু কলেজ বন্ধ করে সৈন্য রাখার বিরোধিতাই করেছিলেন। এইসব তথাকথিত মার্কসবাদীরা অভিযোগ করেছেন যে, 'সিপাহি বিদ্রোহকে কেন তিনি সমর্থন করেননি? সে কি ব্রিটিশ শাসকদের ভয়ে, না তাদের প্রতি অনুগত থাকায়'? বিদ্যাসাগরের চরিত্র সম্পর্কে যাঁর সামান্যতম জ্ঞান আছে, তিনিই জানেন, যেকোনও পরিস্থিতিতে যেকোনও সত্যের প্রয়োজনে নির্ভয়ে দাঁড়াতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না। কলকাতার অন্য গণ্যমান্যরা যখন 'রাজা', 'প্রিন্স', 'রায়বাহাদুর' ইত্যাদি খেতাব পাবার লোভে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ও ভক্তি প্রমাণের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকত, তখন তালতলার চটি পায়ে, সামান্য ধুতি ও চাদর পরা এই পণ্ডিত এসব থেকে শতহস্ত দূরে থেকে নিজের ঐতিহাসিক কর্মযজ্ঞে লিপ্ত থাকতেন। কোনও অনুগ্রহ পাবার জন্য নয়, এদেশে শিক্ষা বিস্তারের স্বার্থে, বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন, বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহ নিবারণের প্রয়োজনে কখনও কখনও সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁকে যেতে হয়েছে এবং সেটা মাথা উঁচু করেই গিয়েছেন, আবার প্রয়োজনে সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়েছেনও। এমনকী ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত খেতাব ও মেডেল নিতে তিনি যাননি এবং তাঁর কাছে সেই মেডেল পাঠাবার পর কী তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেছেন সেটাও অনেকেই জানেন। ফলে এই বিদ্যাসাগরকে ভীরু ও সরকারের অনুগতরূপে চিহ্নিত করা এই বুদ্ধিজীবীদের মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়।

তাহলে তিনি সিপাহি বিদ্রোহকে সমর্থন বা বিরুদ্ধতা — কোনওটাই করলেন না কেন? এটা বুঝতে হলে সিপাহি বিদ্রোহের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করতে হবে। এই বুদ্ধিজীবীরা বলছেন, মার্কস ও এঙ্গেলস এই বিদ্রোহকে 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ' (দি ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স) বলে আখ্যা দিয়েছেন। সত্যিই কি তাই? আমি পুস্তকটি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। কিন্তু কোথাও সিপাহি বিদ্রোহ সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলস-এর এই মূল্যায়ন পাওয়া যায়নি। তাঁরা

এটাকে 'বিদ্রোহ' (রিভোল্ট) আখ্যা দিয়েছেন। 'বিদ্রোহ' আর 'স্বাধীনতার যুদ্ধ' এক নয়, এটা সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়। কিন্তু এই বুদ্ধিজীবীরা তা বুঝতে পারেননি। সেই সময় কি ভারতবর্ষে শিল্পপুঁজি এত শক্তিশালী হয়েছিল যে, তার পক্ষে এক ভারতীয় জাতিবোধ বা জাতীয়তাবাদের জন্ম দেওয়া সম্ভব ছিল? এই বোধ গড়ে ওঠার অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক উপাদান কি সেই সময় পরিপক্ক (ম্যাচিওরড) অবস্থায় পৌঁছেছিল? বিদ্রোহী সিপাহিরা কি স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্র গড়ার আকাঙ্ক্ষা বা স্লোগান নিয়ে এসেছিল — যেটা একমাত্র জাতীয় পুঁজির আকাঙ্খার ভিত্তিতেই আসতে পারে? এই সিপাহি বিদ্রোহের মূল উপাদান কী ছিল? সেটা মূলত ধর্মীয় ছিল, কারণ এইরকম গুজব রটে গিয়েছিল যে বন্দুকের টোটায় হিন্দু-মুসলিম উভয়েরই নিষিদ্ধ খাদ্যবস্তু লাগানো ছিল। হিন্দু ও মুসলিম উভয়েরই ধর্মীয় বিশ্বাসে তা আঘাত করছিল। এমনকী বিধবা বিবাহ প্রবর্তন সম্পর্কেও তাদের অভিযোগ ছিল যে এটা ধর্মে আঘাত করছে। আর একটি কারণ ছিল, ইংরেজ অফিসারদের দ্বারা সিপাহিরা লাঞ্ছিত হত এবং বেতন বৈষম্যের শিকার হত। ক্ষমতাহ্রাসপ্রাপ্ত সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধি রাজা, বাদশা, নবাবদের একদল পুনরায় একচ্ছত্র ক্ষমতাবৃদ্ধির স্বার্থে এই সিপাহি বিদ্রোহকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছিল। ফলে, আর যাই হোক, একে 'ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ' বলা যায় না। মার্কস-এঙ্গেলসও বলেননি। সংশোধনবাদী নেতৃত্বের আমলে ১৯৬৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত মার্কস-এঙ্গেলসের মন্তব্য সংবলিত রিপোর্টগুলির সংকলিত পুস্তকের প্রকাশকরা পুস্তকের এই নামকরণ করেছেন। বিদ্যাসাগর এই বিদ্রোহ সম্পর্কে কিছুই বলে যাননি। ফলে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের অনুমান করেই বলতে হচ্ছে। মনে হয়, তিনি এই বিদ্রোহকে সমর্থন করতে পারেননি যেহেতু এর কারণ ও দাবি ছিল মূলত ধর্মীয় এবং এটা জয়যুক্ত হলে পুনরায় ভারতে মধ্যযুগীয় রাজা-রাজড়াদের শাসনকেই তা ফিরিয়ে আনত এবং ধর্মান্ধতা আরও বাড়ত। আবার যেহেতু সিপাহিরা ব্রিটিশ প্রভুদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হত, সেইজন্য তিনি এই বিদ্রোহের বিরুদ্ধতাও করেননি। যদিও সেই সময়ে বাংলার বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, যদুনাথ সর্বাধিকারি, দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুপ্তরা সিপাহি বিদ্রোহের বিরোধিতাই করেছিলেন। বিদ্যাসাগর কিন্তু এঁদের সাথে যুক্ত হননি।

ফলে বিনয়বাবুরা যে বিশ্লেষণ করেছেন, তার সাথে মার্কসবাদী বিচারধারার কোনও সম্পর্ক নেই। অবশ্য ব্যক্তি হিসাবে বিনয়বাবুকে আমি দোষী করছি না। তিনি সততার সাথে অতি পরিশ্রম করে 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' নামে গ্রন্থটি রচনা করেছেন। কিন্তু যাঁদের সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন, যাঁদের তিনি মার্কসবাদী

হিসাবে গণ্য করতেন, তাঁদের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হয়েই তিনি এত বিরাট এক মানুষ সম্পর্কে এই ধরনের উক্তি ও মূল্যায়ন করেছেন। এদেশের তথাকথিত কমিউনিস্টদের এত অধঃপতনেরও কারণ হচ্ছে, মার্কসবাদ উপলব্ধিতে ব্যর্থতা এবং নবজাগরণের এই অসাধারণ পুরোধা বিদ্যাসাগর ও পরবর্তীতে তাঁর সার্থক অনুগামী শরৎচন্দ্রের মূল্যায়নে তাঁদের শোচনীয় ব্যর্থতা। কারণ যথার্থ কমিউনিস্ট হতে গেলে পূর্ববর্তী যুগের আপসহীন মানবতাবাদী ধারার ধারাবাহিকতায় (continuity) এগিয়ে যেতে যেতে পরবর্তীতে ছেদ (break) ঘটিয়ে আরও উন্নত কমিউনিস্ট মূল্যবোধ অর্জন করতে হবে।

বিদ্যাসাগর যথার্থ আত্মমর্যাদাবোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন

বিদ্যাসাগরের অতি বিরল উজ্জ্বল চারিত্রিক গুণাবলীর আরও কিছু দিক আপনাদের কাছে রাখতে চাই। এগুলি আজও আমাদের সকলের কাছে, বিশেষত যাঁরা যথার্থ বড় হতে চান, তাঁদের অবশ্যই অনুসরণীয়। যথার্থ আত্মমর্যাদাবোধ কাকে বলে তিনি তার আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। সর্বসময়ে তিনি সর্বক্ষেত্রে মাথা উঁচু করে চলতেন, কোনওদিন কোনও কারণে কোথাও এতটুকু মাথা নিচু করেননি। সেই সময় কলকাতার অনেকেই ব্রিটিশ শাসকদের কাছ থেকে নানা অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য তাদের তোয়াজ করে চলত। বিদ্যাসাগর ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন বিদ্যাসাগর হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের অসম্মানজনক আচরণের যে সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন, সেই কাহিনি আমরা প্রায় সকলেই ছোটবেলা থেকে জানি। কিন্তু তাৎপর্য বুঝে তার থেকে শিক্ষা নিয়েছি কয়জন? শাসকগোষ্ঠীর লোকদের তোয়াজ করে চাকরি পাওয়া, চাকরি রক্ষা বা প্রোমোশন পাওয়া, নানা সুযোগসুবিধা পাওয়া, তার জন্য কর্তৃপক্ষের সামনে নতজানু হয়ে থাকা, তাদের লাথিঝাঁটা হজম করা — এসব তো আজও বহু তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায়। আর সেদিন ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে বিদ্যাসাগর কী তেজের সাথে কার সাহেবের সামনে টেবিলে চটিজুতো সহ পা রেখে তার অতি অভদ্র ব্যবহারের জবাব দিয়েছিলেন! কারণ কার সাহেবও ইতিপূর্বে হিন্দু কলেজে বিদ্যাসাগরের সাথে এই আচরণই করেছিলেন। তিনি চাইলে কার সাহেবের ঐ আচরণ নিঃশব্দে হজম করে যেতে পারতেন, অথবা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অনুযোগ জানাতে পারতেন। কিন্তু সে পথে তিনি যাননি। বিদ্যাসাগর এটাকে ব্যক্তিগত অসম্মান হিসাবেও নেননি, নিয়েছেন ভারতবাসীর প্রতি অসম্মান হিসাবে — যাদের ব্রিটিশ শাসকপ্রভুরা কথায় কথায় 'অসভ্য' বলে অপমান করে,

আর নিজেদের 'সভ্য' হিসাবে বড়াই করে। তাই শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক ময়েট সাহেবের কৈফিয়ত চাওয়া চিঠির উত্তরে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে ব্রিটিশ শাসকদের কষাঘাত করে অসম্মানিত ভারতবাসীর পক্ষ থেকে লিখেছিলেন, 'আমি ভেবেছিলাম, আমরা অসভ্য, সাহেবরা সভ্য, সাহেবদের কাছ থেকেই আমাদের সভ্যতা শেখা উচিত। কার সাহেবের কাছে আমি যেমন অভ্যর্থনা পেয়েছিলাম, আমি ভেবেছিলাম, অভ্যর্থনা করার সেটাই সভ্য রীতি। আমি তাই সেভাবেই কার সাহেবকে অভ্যর্থনা করেছি। এতে যদি আমার কোনও অপরাধ হয়ে থাকে তো সে অপরাধের জন্য স্বয়ং কার সাহেবই দায়ী।'† আর এই তীব্র তেজেই শিবনাথ শাস্ত্রীকে তিনি বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই, যাহার নাকে এই চটিজুতা শুদ্ধ পা-খানা তুলিয়া টক করিয়া লাথি না মারিতে পারি।'†

সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্ত যখন কথা দিয়েও সহকারি সেক্রেটারি হিসাবে বিদ্যাসাগরের পাঠক্রম সংক্রান্ত প্রস্তাব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানালেন না, তখন প্রতিবাদে বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করেছিলেন। সেইসময় তাঁর খুবই আর্থিক সঙ্কট চলছিল। রসময় দত্ত বিদ্যাসাগরের পরিচিত একজনকে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন, 'চাকুরি যে ছেড়ে দিল, চলবে কী করে?' বিদ্যাসাগর দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন, 'বিদ্যাসাগর আলু-পটল বেচে খাবে, মুদির দোকান করে খাবে, কিন্তু যে চাকুরিতে সম্মান নেই, সে চাকুরি করবে না।'† আরেকবার ব্রিটিশ সরকার যখন তাঁর বক্তব্য অগ্রাহ্য করে সংস্কৃত কলেজে ব্যালেন্টাইনের সুপারিশ গ্রহণ করল, তখন শেষবারের মতো সংস্কৃত কলেজ থেকে তিনি সরে আসেন। অথচ তখন প্রবল ঋণগ্রস্ত তিনি। তাঁর গুণমুগ্ধ একজন ইংরেজ সাহেবও এনিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করায় বিদ্যাসাগর দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আমি নুন-ভাত খাব, দুবেলার জায়গায় একবেলা খাব, একদিন অন্তর একদিন খাব।'† মর্যাদা রক্ষার স্বার্থে এরকম উত্তর আজও কয়জন দিতে পারেন! বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করার জন্য ভারত সরকার তাঁকে সি.আই.ই পদক দেবে ঠিক করেছিল। আগে জানতে পেরে বিদ্যাসাগর কলকাতার বাইরে চলে যান, যাতে পদক নিতে না হয়। সরকারও নাছোড়বান্দা। কিছুদিন পর তিনি কলকাতায় ফিরে এলে সরকার কর্মচারি ও চাপরাশি দিয়ে তাঁর বাড়িতে পদক পাঠিয়ে দেয়। কর্মচারিরা কিছু বকশিসের আশায় দাঁড়িয়ে ছিল দেখে বিদ্যাসাগর পদকের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে যা বলেছিলেন, তা আজও কয়জন পারেন? তিনি বললেন, 'আমি একটা কথা বলি, তাতে আমারও সুবিধে, তোমাদেরও সুবিধে। এই পদকখানা নিয়ে বাজারে কোনও বেনের দোকানে গিয়ে বেচে দাও। যা পাবে, দু'জনে ভাগ করে নিও।'† একইভাবে তিনি নানা পদক, নানা খেতাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বাংলার ছোটলাট তাঁর গুণগ্রাহী ছিলেন। ছোটলাটের

সাথে দেখা করতে হলে আগে দরখাস্ত দিতে হত। 'প্রাইভেট এন্ট্রি' নামে একটা বিশেষ তালিকা করা হয়েছিল, যাদের নাম এই তালিকায় থাকবে, তারা দরখাস্ত ছাড়াই ছোট লাটের সাথে দেখা করতে পারবে। বিদ্যাসাগরের নাম ওই তালিকায় ছিল। বিদ্যাসাগর এতে আপত্তি করলেন, ছোট লাটের সাথে দেখা করে তালিকা থেকে তাঁর নাম কেটে দিলেন, আর বললেন, 'যেখানে সর্বসাধারণের সুযোগ নেই, আমি সেই সুযোগ নিতে পারি না।' সেইসময় এশিয়াটিক সোসাইটিতে ঢুকতে হলে সাহেবি জুতো পরতে হত। বিদ্যাসাগর দেশীয় চটি পরে সেখানে গেলে তাঁকে প্রথমে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। পরে কর্তৃপক্ষ তাঁকে চিনতে পেরে চটি পায়েই ঢোকার জন্য অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি আর ঢোকেননি। বিদ্যাসাগরের এই চটি ব্যবহার সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী একটি মূল্যবান কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'চটিজুতার প্রতি তাঁহার একটা আন্তরিক আসক্তি ছিল বলিয়াই তিনি যে চটিজুতা ভিন্ন অন্য জুতা পায়ে দিতেন না, এমন নহে। আমরা যে স্বদেশের প্রাচীন চটি ত্যাগ করিয়া বুট ধরিয়াছি, ঠিক তাহা দেখিয়াই যেন বিদ্যাসাগরের চটির প্রতি অনুরাগ বাড়িয়া গিয়াছিল। বাস্তবিকই এই চটিজুতাকে উপলক্ষ করিয়া একটা অভিমান, একটা দর্প তাঁহার অভ্যন্তর হইতে প্রকাশ পাইত।'† যখন কলকাতার প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা দামি দামি দেশি-বিদেশি সজ্জায় ভূষিত হয়ে নানা আসর মাতিয়ে তুলত, নানা তত্ত্ব আলোচনার ঝড় তুলত এবং চিন্তা-আচার-আচরণে ধর্মীয় কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতায় সম্পূর্ণ ডুবে থাকত, তখন সকল বিলাসিতা বর্জিত গ্রাম্য সাধারণ ধুতি চাদর পরিহিত এই মানুষটি পাশ্চাত্যের সর্বাধুনিক জ্ঞানের আলো বহন করতেন। তাই সশ্রদ্ধচিত্তে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'স্বদেশের পরিচ্ছদ গ্রহণ করে তিনি বিদেশের বিদ্যাকে আতিথ্যে বরণ করতে পেরেছিলেন। ... তিনি নবীন ছিলেন এবং চিরযৌবনের অভিষেক লাভ করে বলশালী হয়েছিলেন। তাঁর এই নবীনতাই আমার কাছে সবচেয়ে পূজনীয়, কারণ তিনি আমাদের দেশে চলবার পথ প্রস্তুত করে গেছেন।'[১]

কখনও নীতি-আদর্শের প্রশ্নে বিন্দুমাত্র আপস করেননি

আরেকটা দিক থেকেও বিদ্যাসাগর অসাধারণ বড়ত্ব দেখিয়ে গেছেন। জীবনে কখনও নীতি-আদর্শের প্রশ্নে ঘরে-বাইরে বিন্দুমাত্র আপস করেননি। বেশ কিছু বড় মানুষের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বহু ক্ষেত্রে আপসহীন থেকেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিশেষত পারিবারিক জীবনে আপস করে ফেলেন। যুক্তি ওঠে, 'এ আর এমন কী?' কিন্তু এই ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর অতি বিরল ব্যতিক্রম। কিছু দৃষ্টান্ত আগেই উল্লেখ করেছি, আরও কয়েকটা বলা আবশ্যক। বিদ্যাসাগর ঠাকুরমা, বাবা-মাকে কী গভীর শ্রদ্ধা করতেন, তা সকলেই জানেন। এ নিয়ে অনেক সত্য, অর্ধসত্য, সত্যমিথ্যায়

মিশ্রিত অতিরঞ্জিত কাহিনীও আছে। কিন্তু যেহেতু তিনি ভগবান, পূজো-আর্চা, দীক্ষা-মন্ত্র মানতেন না, সেজন্য এঁরা বলা সত্ত্বেও তিনি দীক্ষা নিতে রাজি হননি; এঁরা দুঃখ পেলেও তিনি বিশ্বাসে অটল ছিলেন; রামকৃষ্ণ বাড়ি এসে নিমন্ত্রণ করা সত্ত্বেও দক্ষিণেশ্বরে যাননি। এমনকী মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তাঁর মেয়ে যে হোমের আয়োজন করেছিল, তাতেও মেয়ের কাতর আবেদন সত্ত্বেও যোগ দেননি। একথাগুলো আগেই বলেছি। আরও কিছু জানা দরকার। তাঁর ছেলে যখন স্বেচ্ছায় বিধবা বিবাহ করতে সম্মত হয়, তিনি খুশি হয়েছিলেন। ভাই জানাল, এই বিয়ে করলে আত্মীয়-কুটুম্বরাও সম্পর্ক রাখবে না, ফলে এটা বন্ধ করা দরকার। তার উত্তরে তিনি জানালেন, বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের আন্দোলনকে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম গণ্য করেন। এর জন্য সর্বস্ব, এমনকী জীবন দিতেও প্রস্তুত আছেন। দৃপ্তকণ্ঠে আরও বলেছেন, 'আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি; নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব। লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।'† আবার, নিজের ছেলে যখন কিছুদিন পর তার স্ত্রীকে অসম্মান করতে লাগল, নানা খারাপ কাজে লিপ্ত হল, তিনি বাবা-মা-স্ত্রী-ভাইদের আপত্তি অগ্রাহ্য করেই একমাত্র ছেলেকে ত্যাজ্য ঘোষণা করে জানালেন, 'আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুক্ত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যারপরনাই যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী। এজন্য ও অন্য অন্য গুরুতর কারণবশত আমি তাহার সংশ্রব ও সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছি। ...'† নিজের স্ত্রীর সাথে এই প্রশ্নে বিদ্যাসাগরের তীব্র মতভেদ হয় এবং তাঁর সাথে সম্পর্কের অবনতিও ঘটে, কিন্তু তিনি সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। বিদ্যাসাগরের জামাই সূর্যকুমার অধিকারী মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। হঠাৎ বিদ্যাসাগর একদিন টের পেলেন, ফান্ডে ৩-৪ হাজার টাকার হিসাব নেই। সাথে সাথে জামাইকে ডেকে এনে তীব্র তিরস্কার করে বরখাস্ত করে দিলেন। বিধবাবিবাহের প্রবর্তক হয়েও বিদ্যাসাগর কোনও কারণে তাঁর নিজের এলাকায় একটি বিধবাবিবাহে অসম্মতি জ্ঞাপন করে তা থেকে অন্যদের বিরত হতে বলেছিলেন, কিন্তু তাঁর ভাইয়েরা তাঁর মত অগ্রাহ্য করেই এই বিয়ে দিয়ে দেয়। এতে তিনি এতই আঘাত পান যে বাবা-মা-ভাইদের ও এলাকার লোকদের জানিয়ে দেন যে, দেশে তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুল ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাঁর আর্থিক সাহায্য অব্যাহত থাকলেও তিনি আর দেশে যাবেন না। এরপর তিনি আরও বিশ বছর বেঁচেছিলেন, কিন্তু কোনওদিন দেশে যাননি। এই ধরনের জানা-অজানা বহু ঘটনা আছে। অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলবেন, এতটা বাড়াবাড়ির কী প্রয়োজন ছিল, ছোটখাটো কিছু অন্যায় তো মেনে নিলেই পারতেন। না, বিদ্যাসাগর সেটা পারেননি। আর এজন্যই তিনি এত বিশাল চরিত্রের অধিকারী হয়েছিলেন। ঘরে-বাইরে তিনি সর্বত্রই মিথ্যা-অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন যোদ্ধা ছিলেন। অনেকেই

আছেন, বাইরে অনেক ন্যায়-অন্যায়ের উপর বক্তৃতা দেন, বড় বড় কথা বলেন, কিন্তু কাজকর্মে, আচার-আচরণে সম্পূর্ণ বিপরীত করেন। এরা ভণ্ড। আজকাল দেশে, বিশেষত বুদ্ধিজীবী মহলে ও রাজনীতিতে এদের সংখ্যাই বাড়ছে। আর একদল আছেন, যাঁরা নীতি-আদর্শের পথে চলতে চান, কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলে, নানা ঝঞ্ঝাটে পড়লে পিছিয়ে আসেন। আবার, আর একদল আছেন, আমাদের মধ্যেও আছেন, যাঁরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে নীতি-আদর্শ অনুযায়ী চলেন, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিশেষত ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনে নানা দুর্বলতার জন্য আপস করে ফেলেন। আজ আমাদের এই মহৎ চরিত্র থেকে শিক্ষা নিতে হবে, কীভাবে ঘরে-বাইরে সর্বত্র সব প্রশ্নে নীতি-আদর্শ অনুযায়ী আপসহীন সংগ্রাম চালাতে হয়। লোকে কী ভাববে বা বলবে, সমাজে কী প্রশ্ন উঠবে — এসব ভেবে তো বিদ্যাসাগর ঠাকুরমা, বাবা-মা, ভাই, স্ত্রী, ছেলের সাথে আপসহীন আচরণ করেননি। যদি তিনি কোনও কোনও ছোটখাট ক্ষেত্রে আপস করতেনও, তবুও তিনি অন্য বহু প্রশ্নে যে বিশাল কর্মযজ্ঞ করেছিলেন, তাতেও ইতিহাসে তাঁর নাম-যশ অক্ষুণ্ণ থাকত। কিন্তু এভাবে তিনি ভাবতেই পারেননি। তিনি সেই যুগের শ্রেষ্ঠ আদর্শ মানবতাবাদী মূল্যবোধভিত্তিক উন্নত রুচিসম্মত জীবনযাপন করতে চেয়েছিলেন এবং করেছেন। প্রয়োজনে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, জরাগ্রস্ত, রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়ে লড়তেও এতটুকু দ্বিধা করেননি। ইতিহাসে এই ধরনের চরিত্র কয়টা পাওয়া যায়?

সর্বোচ্চ নৈতিক মূল্যবোধের পরিচয় দিয়ে গেছেন

প্রসঙ্গত, বিদ্যাসাগরের উন্নত নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতে চাই। কেউ, এমনকী কোনও অপরিচিত ব্যক্তিও, যদি কোনও বিষয়ে তাঁর কোনও ভুল ধরিয়ে দিত, তিনি সাথে সাথে তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করতেন। 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে একটি ঘটনা পাওয়া যায়। তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের, সম্ভবত বরিশাল জেলার মোহাম্মদ রিয়াজুদ্দিন আহম্মদ নামে খুবই অল্পবয়সী এক যুবকের মনে হয়েছিল, বোধোদয় পুস্তকে কিছু ভুল আছে। অনেক ভেবেচিন্তে সঙ্কোচ-দ্বিধা নিয়ে বিদ্যাসাগরকে চিঠি লিখে সে তা জানায়। সে ভাবেওনি, এর কোনও উত্তর আসবে। কয়েকদিন বাদে বিস্মিত হয়ে সে দেখে, বিদ্যাসাগর ভুল স্বীকার করে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। তারপর যতদিন বিদ্যাসাগর বেঁচে ছিলেন, বোধোদয় পুস্তকে ঐ ভুল স্বীকার করে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হত। এরকম আরও কিছু ঘটনা আছে। তিনি বলতেন, 'জ্ঞানপূর্বক কাহাকেও প্রতারণা করা, আর কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া কোন অংশে এ বিষয়ে প্রতিকূল আচরণ করা — এই উভয়ই অত্যন্ত গর্হিত কর্ম।'† নিজের জীবনে এই আদর্শ

তিনি অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করতেন। অপরিচিত অনেককেই তিনি বিপদে সাহায্য করতেন। কেউ কেউ মিথ্যা বলেও তাঁর কাছ থেকে সাহায্য নিত। একবার একজন এ ব্যাপারে ধরা পড়ে যায়। বিদ্যাসাগরের সহকারী তাঁকে বলেন যে, 'আপনাকে ভালো মানুষ পেয়ে অনেকেই এভাবে ঠকায়।' এর উত্তরে বিদ্যাসাগরের অমূল্য উক্তি, 'পরের সাহায্য করতে গেলে মধ্যে মধ্যে ঠকতে হয়। ঠকানোর চেয়ে ঠকা ভালো।'† এভাবে তিনি কখনও কখনও ঠকেছেন, কিন্তু কাউকে কোনও কারণে ঠকাননি, সাহায্যদানে বিরতও হননি। তাঁর বিরুদ্ধপক্ষ তাঁর নামে কত কুৎসা রটিয়েছে. কত মিথ্যা বলেছে, কতভাবে আঘাত করেছে, কিন্তু তিনি কখনও ধৈর্যচ্যুত হয়ে কাউকে পাল্টা আঘাত করেননি। বিরুদ্ধ পক্ষের বক্তব্যকে ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেছেন। বিরুদ্ধপক্ষ বা নিন্দুকদের প্রতি তাঁর আচরণ কত রুচিসম্পন্ন ছিল, সেটা পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁর আচরণে। বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষে' তাঁর সম্পর্কে কী গর্হিত মন্তব্য করেছেন, বঙ্গদর্শনে কীরূপ শ্লেষাত্মক বিরূপ মন্তব্য করেছেন, দুঃখ পেলেও বিদ্যাসাগর তা নিয়ে কোনও সমালোচনা করেননি। বরং বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদানকে তিনি স্নেহ ও প্রশংসার চোখেই দেখতেন। কোনও এক চাটুকার ভেবেছিল, বঙ্কিমের সমালোচনা করলে বিদ্যাসাগর খুশিই হবেন। এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের আচরণ আজও আমাদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ। চাটুকার বলল, 'জানেন তো বিদ্যাসাগর মশাই, বঙ্কিমচন্দ্র সারাদিন ইংরেজের অধীনে ডেপুটিগিরি করে, আর রাতে মদ-বাইজি নিয়ে থাকে।' বিদ্যাসাগর তাকে সম্পূর্ণ হতাশ করে বললেন, 'বল কী, তাহলে তো বঙ্কিমের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। সারাদিন অফিসের কাজের পর রাত্রিবেলা এসব করে বেড়ায়। তারপরেও এত সুন্দর সুন্দর বই লেখে কি করে?'† একবার ভেবে দেখুন, কত উঁচুদরের মানুষ ছিলেন তিনি!

বিপন্ন মানুষকে সাহায্য করাই তাঁর জীবনধর্ম ছিল

দয়া করছি, দান করছি মানে অভাবী কেউ হাত পাতছে, আর আমি উপর থেকে তাকে কিছু দিচ্ছি, এর মধ্যে একটা আত্মশ্লাঘা থাকে, অহঙ্কার থাকে। অনেকে পরকালের দিকে তাকিয়ে দয়া করে, দান করে, আর একদল নাম-যশ-খ্যাতির জন্য করে। বিদ্যাসাগরের এসবের কোনওটাই ছিল না। কারণ, তিনি পরকালে বিশ্বাস করতেন না, নাম-যশের পিছনেও ছুটতেন না। আবার তিনি যথার্থই দয়া ও করুণার সাগর ছিলেন। কারণ এই দয়া ও করুণার গভীরতা ও ব্যাপকতার কোন সীমা ছিল না। নিজে যে ছোটবেলায় দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে কাটিয়েছেন এবং অপরের সাহায্যে এবং নিজের কঠোর সংগ্রামের ফলে দাঁড়িয়েছিলেন, এটা তিনি কোনওদিন ভুলতে পারেননি। তাই সাহিত্যিক জলধর

সেন যখন কিশোর বয়সে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে নিজের দুঃস্থ অবস্থা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন, তখন বিদ্যাসাগর সস্নেহে আদর করে তাঁর চোখের জল মুছে দিয়ে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'দারিদ্র্য অপরাধ নয়। আমিও তোর মতো দরিদ্র ছিলাম।'† একইভাবে তিনি কবি নবীনচন্দ্র সেনকেও কলকাতায় থাকা ও পড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তাঁর আর্থিক দুরবস্থার কারণে। দু'জনেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁদের জীবনে বিদ্যাসাগরের এই অবদানের কথা বারবার স্মরণ করেছেন শ্রদ্ধাবনতচিত্তে। এরকম দরদী মন নিয়ে চেনা-অচেনা কতজনকে তিনি গ্রামে-শহরে সাহায্য করেছেন, নিজে খেয়ালও রাখতেন না, কাউকে বলতেনও না। মানুষের বিপদে, দুঃখে, অসহায় অবস্থায় মানুষ হিসাবে সাহায্য করা, পাশে দাঁড়ানো একান্ত কর্তব্য বলেই মনে করতেন। বিপন্ন হয়ে তাঁর কাছে এসে সাহায্য না পেয়ে কেউ ফিরে যায়নি। এমনকী তাঁর কাছে আসেনি, অপরের মুখে কারও দুরবস্থা শুনে তিনি সাহায্য পাঠিয়েছেন। নিজে যা আয় করেছেন দু'হাতে সাহায্য করেছেন, ধার করেও অপরকে সাহায্য করেছেন। অপরের বিপদে সাহায্য করা তাঁর জীবনধর্ম হয়ে গিয়েছিল। বিদ্যাসাগরের উইলটিও একটি ঐতিহাসিক দলিল হয়ে আছে। ধর্মে বিশ্বাস করতেন না, ফলে কোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য কিছুই বরাদ্দ করেননি। আত্মীয়-অনাত্মীয়সহ বিশাল তালিকা, এদের মধ্যে পুত্রহীন মাতা, বিধবা পত্নী, স্বামী পরিত্যক্তা স্ত্রী, দারিদ্র্যপীড়িত পরিবার হতে শুরু করে বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দাতব্য চিকিৎসালয়ও আছে। সবকিছু এভাবে এমন করে বিলিয়ে দিয়ে গেছেন যে, তাঁর দুই কন্যাকে পরবর্তীকালে চরম দারিদ্র্যে অপরের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হতে হয় এবং এদের একজনকে কাশীতে অপরের বাড়িতে কাজ করতেও হয়। ১৯২৫ সালে ১৯ এপ্রিল আনন্দবাজারে প্রকাশিত এরই করুণ কাহিনী সংবলিত ডাক্তার শ্রীমতি বিধুমুখী চৌধুরীর প্রকাশিত আবেদন পড়লে চোখের জল সংবরণ করা কষ্টকর হয়। তিনি লিখছেন, '... বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা তাঁহার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি ও তাঁহার তৃতীয় ভগ্নী উভয়েই অত্যন্ত কষ্টে কালাতিপাত করিতেছেন। ... এখনও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্নে পরিপুষ্ট ব্যক্তির বংশধর বাঙলাদেশে অনেকেই আছেন। অন্নে পরিপুষ্ট না হলেও বঙ্গদেশে এমন লোক খুবই বিরল যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঋণী নন; অতএব আশা করা যায়, প্রত্যেকেই সেই মহাপুরুষের স্মৃতি মনে রাখিয়া তাঁহার সন্তানগণকে এই দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইবেন।'† অনেকেই এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। যে বিদ্যাসাগর এভাবে সবকিছু দিয়ে গিয়েছিলেন, নিজের সন্তানেরা বিপন্ন হতে পারে এটা হিসাব করে তাদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করার কথাও ভাবেননি, সেই বিদ্যাসাগরকে ইতিহাস কী চোখে দেখবে?

উচ্চবিত্তবানরা নয়, সাধারণ গরিব মানুষই ছিল বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে আপনজন

তিনি বলেছিলেন, 'যতদিন বেঁচে থাকি, যথাসাধ্য পরের জন্য যা পারি করবার চেষ্টা করব।' বিদ্যাসাগর যে দারিদ্র্যপীড়িত-বঞ্চিত মানুষের প্রতি অসীম দরদবোধ বুকে বহন করতেন, একথা আগেই আপনাদের বলেছি। এবার এ সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি উক্তি ও কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই, যার তাৎপর্যও অপরিসীম। তিনি জানতেন, সমাজের যা কিছু সম্পদ, এই গরিব মানুষদের অক্লান্ত পরিশ্রমেই তা উৎপাদিত হয়, অথচ ভোগ করে ধনী ব্যক্তিরা। তাই শিক্ষিত ধনীদের ধিক্কার জানিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'আমরা নিম্নশ্রেণীকে পশু অপেক্ষাও ঘৃণার চক্ষে দেখি। হায় শিক্ষিত শ্রেণীর এতই অহঙ্কার, এতই অভিমান, দেশের শক্তি যাহারা, আশা-ভরসার স্থল যাহারা, তাহাদিগকে মনুষ্যের শ্রেণীতে গণ্য করিতেও কুণ্ঠিত হয়।' † তিনি সারাজীবন যতটা সম্ভব এই শিক্ষিত ভদ্র সমাজকে এড়িয়ে চলতেন এবং নিঃস্ব গরিব মানুষদের একান্ত আপনজন গণ্য করে মিশতেন। গরিবরাও যাতে নিজেদের দৈন্যের জন্য আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে ধনীদের দাসত্ববৃত্তি না করে, তার জন্য বলেছিলেন, 'মনুষ্যের অবস্থা যত হীন হোক না কেন, আপনার মান অপমানের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, দাসবৎ অন্যের অনুবৃত্তি, কোনক্রমেই বিধেয় নহে।' †

একদিন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে দেখলেন, বিদ্যাসাগর এক মুদি দোকানের সামনে রাস্তায় বসে তামাক খাচ্ছেন, আর গল্প করছেন। পরে দেখা হলে বিদ্যাসাগরকে সমালোচনাচ্ছলে তিনি বলেন, 'আপনি এইসব লোকেদের সঙ্গে মেশেন কেন।' উত্তরে বিদ্যাসাগরের বিখ্যাত উক্তি, 'দ্যাখো, ওদের নিয়েই আমাদের ঘরকন্না, ... রাজামহারাজাদের নিয়ে তো আর আমাদের ঘরকন্না নয়। ... ... তোমাদের ছাড়তে পারি, কিন্তু ওদের ছাড়তে পারি না।' † লক্ষ করুন, তিনি বলছেন, এই সাধারণ গরিবদের নিয়েই তাঁর ঘরকন্না, উচ্চবিত্তবানদের ছাড়তে পারেন, কিন্তু এইসব আপনজনদের ছাড়তে পারেন না। আরেকটি বিষয়ও বলা দরকার, তিনি উঁচুজাত-নিচুজাত-হিন্দু-মুসলিম ছোঁয়াছুঁয়ি এসব মানতেন না। দুর্ভিক্ষের সময়ে বীরসিংহে অন্নছত্রের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর কানে এল হাড়ি-ডোম-মুচির ঘরের মেয়েদের মাথায় তেল না জোটায় খুবই অসুবিধা হচ্ছে। ফলে তিনি তাদের জন্য তেল বরাদ্দ করেছেন। কিন্তু যারা দিচ্ছেন, তারা ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়ে উপর থেকে তাদের হাতে তেল দিচ্ছেন। এটা দেখে বিদ্যাসাগর এগিয়ে এসে নিজেই ওদের মাথায় তেল মাখিয়ে দিলেন, যেন মা নিজের সন্তানের মাথায় মাখিয়ে দিচ্ছেন। গভীর শ্রদ্ধায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "... তাঁহার দয়ার মধ্য হইতে

যে একটি নিঃসঙ্কোচ বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তাহা দেখিয়া আমাদের এই নীচজাতির প্রতি চির অভ্যস্ত মনও আপন নিগূঢ় মানবধর্ম ... ... ভক্তিতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।" [১] বর্ধমানে মুসলিম পাড়ায় যখন কলেরা মহামারীর রূপ ধারণ করে, তিনি হোমিওপ্যাথি ওষুধ নিয়ে সেখানে ছুটে যান, নিজের কোলে বসিয়ে রোগীকে ওষুধ খাওয়ান ও সেবা করেন। ধর্মাধর্ম বিচার করেননি। এই প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে দুপুরবেলায় তিনি ও আরও কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি এক ধনী ব্যক্তির বৈঠকখানায় কথাবার্তা বলছিলেন। মাথার উপরে টানা পাখা চলছিল। এমন সময়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে এক বৃদ্ধ দারোয়ান বিদ্যাসাগরকে একটি চিঠি দিতে এসেছিলেন। তার এই অবস্থা দেখে বিদ্যাসাগর সেই দারোয়ানকে কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য জোর করে পাশে বসালেন। দারোয়ান বেরিয়ে গেলে অন্যেরা ক্ষিপ্ত হয়ে প্রশ্ন করল, 'আপনি একজন দারোয়ানকে আমাদের সঙ্গে বসালেন?' এর উত্তরে তিনি যা বললেন সেটাও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি বললেন, 'বিচার কীভাবে হবে, হিন্দুমতে না অন্যমতে? হিন্দুমতে বিচার শোনো, এই দারোয়ান একজন কনৌজি ব্রাহ্মণ। ওরা আমাদের জল পর্যন্ত স্পর্শ করে না। তোমাদের বাপ-ঠাকুর্দা আজ এখানে থাকলে ওর পায়ের ধূলো এই জাজিমে না পড়ে তাদের মাথায় উঠত। অন্যমতে বিচার শোনো। আমরা সকলে পাঁচশো, সাতশো, হাজার টাকা মাইনে পাই। ওই দারোয়ান পাঁচ টাকা মাইনে পায়। এই অবস্থায় আমি ওকে অবজ্ঞা করতে পারি না, কারণ আমার বাবা বড়বাজারে এক দোকানে পাঁচ টাকা মাইনেয় কাজ করতেন। ওকে অবজ্ঞা করার আগে আমার বাবাকে অবজ্ঞা করতে হয়।' † বড় বড় কথা অনেকেই বলতে পারে। কিন্তু এভাবে গরিবদের মর্যাদা রক্ষা করতে কয়জন পারে? এইজন্যই তিনি অসাধারণ!

এই অসাধারণত্ব ফুটে উঠেছে আর একটি ঘটনায়। পুরুষশাসিত সমাজে অত্যাচারিত, বঞ্চিত ও প্রতারিত হয়ে একদল মহিলা বাধ্য হয়ে দেহবিক্রির বাজারে পণ্য হয়ে রাস্তায় দাঁড়ায়। তথাকথিত ভদ্রসমাজ তাদের 'কুলটা', 'বেশ্যা' বলে গাল দিয়ে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিজেদের 'শুদ্ধতা' রক্ষা করে। বিদ্যাসাগর জানতেন, কেন, কার দোষে এদের জীবনে এই চরম দুর্গতি। একদিন সন্ধ্যায় তিনি বৌবাজার দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। দেখলেন, ঝিরঝির বৃষ্টিতে ভিজে একজন নারী খদ্দেরের প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে আছে। বিদ্যাসাগর দ্রুত এগিয়ে গেলেন, পকেটে যা কিছু ছিল তার হাতে দিয়ে বললেন, 'ফিরে যাও মা, আর জলে ভিজো না।' কী অসীম মমতায় তাকে মাতৃসম্বোধন করলেন! বিহারীলাল সরকার লিখেছেন, প্রায়ই রাত্রিবেলা বাড়ি ফেরার পথে এই নারীদের তিনি আর্থিক সাহায্য দিয়ে ঘরে পাঠিয়ে দিতেন। আরেকটি ঘটনা উল্লেখ না করলে বিদ্যাসাগরের এই সংক্রান্ত জীবনকথা

অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাঁর মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগের ঘটনা। তখন তিনি খুবই অসুস্থ। শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে, শয্যাশায়ী হয়ে আছেন। অনুরাগীরা পীড়াপীড়ি করছেন, কার্মাটারে যাওয়ার জন্য, সেখানকার জলবায়ু ভালো, সেখানে গেলে তাঁর শরীর ভালো হতে পারে। এই পরামর্শে মৃত্যুপথযাত্রী এই মহান পুরুষ কেঁদে ফেলে অসম্মতি জানিয়ে যে উক্তি করেছিলেন তাও স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি বলেছিলেন, 'আমার যদি অতুল ঐশ্বর্য থাকতো, তাহলে সেখানে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারতাম, শরীর-মন ভালো থাকতো। আমার সে ক্ষমতা কই? দ্যাখো, কার্মাটারে এক সের চালের ভাত, আধ সের অড়হর ডাল, আধ সের আলু, আর এক সের মাংস যে অনায়াসে খেতে পারে, তাকে আজকাল পোয়াটাক ভুট্টার ছাতু খেয়ে থাকতে হয়, তার বেশি আর জোটে না। আমি সেখানে গিয়ে দিব্যি খাওয়াদাওয়া করব, আর আমার চারিদিকে সাঁওতালেরা না খেয়ে মারা যাবে, দেখব — একি আমি সইতে পারি?' আসন্ন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে অনাহারক্লিষ্ট গরিব মানুষদের প্রতি এই মর্মবেদনা, নিজের জীবন বাঁচানোর ঊর্ধ্বে তাকে স্থান দেওয়া, মানব ইতিহাসে কয়জন পেরেছে? আপনারা জানেন, এই সংখ্যা খুবই অল্প। আর তাঁরাই যুগ যুগ ধরে বেঁচে আছেন ও থাকবেন।

জাতীয় কংগ্রেসের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তাঁর ঐতিহাসিক উক্তি

সর্বশেষে আরেকটা বিষয়ও আলোচনা করা দরকার। আপনারা জানেন, বিদ্যাসাগরের সময়ে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন পূর্ণরূপ নেয়নি। ইউরোপে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লব, গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রভাবে তাঁর শেষ জীবনে এদেশের শিক্ষিত সমাজের একদল বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভাবে প্রভাবিত হচ্ছিল। ইতিপূর্বে কম্প্রাডর পুঁজির একাংশ শিল্পপুঁজিতে রূপান্তরিত হয়েছিল, যদিও হোমোজিনিটি (সমসত্ত্বা) অর্জন করে জাতীয় পুঁজির স্তরে আসেনি, অবশ্য ধীরে ধীরে সেদিকেই এগোচ্ছিল। ফলে জাতীয়তাবাদ দেশের গর্ভে ভ্রূণ অবস্থায় বিকশিত হচ্ছিল। এই অবস্থায় বিদ্যাসাগর রচিত 'কথামালা'য় গল্পচ্ছলে কথিত একটি নীতিবাক্য পরবর্তীকালের স্বদেশি আন্দোলনে অমূল্য পাথেয় হিসাবে কাজ করে গেছে। একটি কুকুর সারাদিন শেকলে বাঁধা থাকে, রাতে তাকে মনিব ছেড়ে দেয় এবং অনেক ভালো ভালো খাবার দেয়। আরেকটা বাঘ বল্গাহীন ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু অনাহারে থাকছে। তখন কুকুরটা বাঘকে পরামর্শ দিচ্ছে, এখানে এসে আমার মতো মনিবের শেকলে বাঁধা হয়ে থাকো, তাহলে অনেক খাবার পাবে। তার উত্তরে বাঘ বলছে, 'নিতান্ত পরাধীন হইয়া রাজভোগে থাকা অপেক্ষা স্বাধীন থাকিয়া অনাহারের ক্লেশ পাওয়া সহস্রগুণে ভালো।' দেশে দেশে

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে এই ছোট্ট মন্তব্যটির তাৎপর্য অপরিসীম। পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র রচিত 'পথের দাবী'র বিপ্লবী নায়ক সব্যসাচীর কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছিল, 'স্বাধীনতার বিনিময়ে পরাধীন স্বর্গরাজ্য চাই না।' বিদ্যাসাগরের শেষ জীবনে ১৮৮৬ সালে কিছু উচ্চবিত্তবান বাবু জাতীয় কংগ্রেসের সূচনা করেন ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদনের প্ল্যাটফর্ম হিসাবে। পরের বছর এই কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন কলকাতায় করার তোড়জোড় হচ্ছে শুনে বিদ্যাসাগর যে মন্তব্য করেছেন, তার তাৎপর্য আজও বিরাট। জাতীয় কংগ্রেসের কর্তাদের মাথায় দেশের অনাহারক্লিষ্ট মানুষের জন্য কোনও ভাবনা নেই দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, 'বাবুরা কংগ্রেস করছেন, আস্ফালন করছেন, বক্তৃতা করছেন, ভারত উদ্ধার করছেন, দেশের হাজার হাজার লোক প্রতিদিন অনাহারে মরছে, সেদিকে কারও চোখ নেই।' † এরপর কয়েকজন উদ্যোক্তা যখন তাঁকে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে আসেন, তিনি সরাসরি তাদের প্রশ্ন করেন, 'দেশের স্বাধীনতা পেতে গেলে শেষ পর্যন্ত যদি দরকার হয়, তোমরা কি তরোয়াল ধরতে পারবে?' এই প্রশ্ন শুনে আমন্ত্রণকারীরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আমতা আমতা করছিলেন। তখন বিদ্যাসাগর উত্তর বুঝে নিয়ে স্পষ্ট বলে দিলেন, 'তাহলে আমাকে বাদ দিয়েই তোমরা এই কাজে এগোও।' † অর্থাৎ যে কংগ্রেস দেশের বুভুক্ষু গরিবদের স্বার্থ ভাবছে না, ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ে যাবে না, সেই কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার তাঁর কোনও উৎসাহ নেই।

আপসমুখী বুর্জোয়া জাতীয় নেতৃত্ব ও তথাকথিত মার্কসবাদীরা বিদ্যাসাগরের সংগ্রামকে সফল হতে দেয়নি

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর কয়েক বছর পরেই জাতীয়তাবাদী চিন্তা শৈশব অতিক্রম করে কৈশোরে পদার্পণ করে এবং তাঁর মৃত্যুর ১৪-১৫ বছর পরেই বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন উপলক্ষে প্রথম মধ্যবিত্ত সশস্ত্র বিপ্লববাদ আত্মপ্রকাশ করে। ভারতবর্ষে নানা রাজ্যে বিচ্ছিন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। ইতিমধ্যে দেশীয় পুঁজিও সংহত হয়ে হয়ে জাতীয় পুঁজিতে পরিণত হয়ে প্রথম মহাযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে শক্তিশালী হয় এবং জাতীয় কংগ্রেসকে নিজস্ব জাতীয় আকাঙক্ষা পূরণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে থাকে। পূর্বেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বপুঁজিবাদ পূর্বতন স্বাধীন প্রতিযোগিতার স্তর অতিক্রম করে একচেটিয়া পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদের স্তরে উপনীত হয়ে প্রগতিশীলতা হারিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। ভারতীয় জাতীয় পুঁজিবাদের জন্ম বিশ্বপুঁজিবাদের এই প্রতিক্রিয়াশীল স্তরেই। ফলে ভারতীয় জাতীয় পুঁজিবাদ সূচনাপর্বতেই ইউরোপীয় পুঁজিবাদের প্রথম যুগের মতো বিপ্লবাত্মক ছিল না। অন্যদিকে ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় লেনিন-স্ট্যালিনের নেতৃত্বে পুঁজিবাদবিরোধী

শ্রমিকবিপ্লব সংগঠিত হয়। এর ফলে এদেশের শঙ্কিত জাতীয় পুঁজিপতিশ্রেণি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সশস্ত্র বিপ্লববিরোধী আপসকামী শক্তির ভূমিকা পালন করতে থাকে। জাতীয় কংগ্রেসও সেইভাবেই পরিচালিত হতে থাকে। অন্যদিকে বিদ্যাসাগরের সময়েই তাঁর ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত সেক্যুলার মানবতাবাদী চিন্তাধারা এদেশের রক্ষণশীল সমাজ গ্রহণ করতে পারেনি। তখনও সমগ্র সমাজ আধ্যাত্মিকতা-ধর্মীয় চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিল। বিদ্যাসাগর প্রস্তাবিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিভিত্তিক সেক্যুলার চিন্তাও ব্রিটিশ সরকার চালু করতে দেয়নি। রামকৃষ্ণ-বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দ এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যাঁর যাঁর মতো করে অধ্যাত্মবাদের সাথে মানবতাবাদের মিশ্রণ ঘটিয়ে মূলত ধর্মীয় মানবতাবাদেরই জয়গান করে গেছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন শরৎচন্দ্র, বিপ্লবী মানবতাবাদী সাহিত্যিক হিসাবে যিনি 'পথের দাবী'তে বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করেছিলেন, 'সমস্ত ধর্মই মিথ্যা, আদিম দিনের কুসংস্কার — বিশ্বমানবতার এতবড় পরম শত্রু আর নেই।' এভাবে বিদ্যাসাগরের পতাকাকে তিনি তুলে ধরলেও এদেশের মূল ধারা হিসাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় মানবতাবাদই থেকে গেল এবং যাকে বিজ্ঞান ও যুক্তিবিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবভীত বুর্জোয়ারা নিজেদের শ্রেণিস্বার্থেই লালনপালন ও ব্যবহার করতে লাগল। ফলে এই বুর্জোয়াশ্রেণী সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণা, অধ্যাত্মবাদ-ধর্মীয় চিন্তা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লববিরোধী সংস্কারবাদী পথেই স্বাধীনতা আন্দোলনকে পরিচালিত করতে চাইল। তার স্বার্থে জাতীয় কংগ্রেস সেই ভূমিকাই পালন করল। এর ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। কারণ মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদ সংগঠিত জাতীয় পুঁজিবাদের বিকল্প হতে পারে না এবং পারেওনি, আর তথাকথিত কমিউনিস্টরা এদেশে যথার্থ মার্কসবাদী আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। ফলে বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠে মধ্যবিত্ত বিপ্লবীদের সহযোগিতায় আপসমুখী সংস্কারপন্থীদের বিকল্প আপসহীন বৈপ্লবিক সংগ্রাম গড়ে তুলতে পারেনি। এরই ফলে বিদ্যাসাগরের এতবড় মহৎ সংগ্রাম ও সাধনা কার্যকর করা গেল না, একথা অতি দুঃখের সাথেই বলতে হচ্ছে। এর শোচনীয় পরিণতি কী ঘটেছে সেটা আপনারা আজ সকলেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছেন। ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত সেক্যুলার মানবতাবাদী চিন্তার পরিবর্তে ধর্মীয় এবং বিশেষভাবে হিন্দুধর্মীয় জাতীয়তাবাদী চিন্তার ভিত্তিতে জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ হয়েছে সমাজের গণতন্ত্রীকরণের ভিত্তিতে ধর্ম-জাত-পাত-ভাষাগত ভেদাভেদ মুক্ত সর্বাত্মক জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে। এরই ফলে দেশ বিভক্ত হয়েছে এবং আজও সাম্প্রদায়িকতা-প্রাদেশিকতা-বর্ণবিদ্বেষের আগুন প্রায়ই জ্বলে উঠছে। ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দলগুলি জনগণের ঐক্য ভাঙা ও ভোটের স্বার্থে এই আগুন জ্বালাচ্ছেও বারবার। বিদ্যাসাগরের

মৃত্যুশতবার্ষিকীর বছরেই একটা ঐতিহাসিক সৌধ বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হল পৌরাণিক কাল্পনিক চরিত্র রামচন্দ্রের জন্মভূমির অজুহাত তুলে। পুরুষশাসিত সমাজের শৃঙ্খল থেকে যে নারীদের মুক্ত করার জন্য তিনি এত লড়াই করে গেছেন, সেই নারী আজও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বন্ধনে শৃঙ্খলিত হয়ে আছে। বিধবাবিবাহ আজও শ্রদ্ধার সাথে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু-সমাজ গ্রহণ করেনি। আজও অধিকাংশ পরিবারে নারী অবাঞ্ছিত, প্রতিবছর হাজার হাজার কন্যাভ্রূণ হত্যা হয়ে চলেছে, বাল্যবিবাহও ঘটে চলেছে, বধূনির্যাতন-বধূহত্যা, নারী ধর্ষণ আজ এদেশের নিয়মিত ঘটনা। প্রতিবছর ৭-৮ বছরের বালিকা সহ লক্ষ লক্ষ নারী দুঃসহ দারিদ্রে দেহবিক্রির বাজারে পণ্য হচ্ছে। এত ভয়াবহ পরিস্থিতি বিদ্যাসাগর দেখে যাননি। শিক্ষার নামে কী চলছে, সেটাও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ধর্মীয় শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিরোধী মনন তৈরির হীন উদ্দেশ্যে। অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসিত যুগেই শিক্ষা নিয়ে যে ব্যবসার উল্লেখ বিদ্যাসাগর করেছেন, সেটা আজ আরও ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে, শিক্ষাকে বাজারের পণ্যে পরিণত করা হয়েছে। সর্বোপরি যে দরিদ্র মানুষের অভাব-অনটন দেখে বিদ্যাসাগর ব্যথায়-যন্ত্রণায় ছটফট করতেন, বারবার তাদের কাছে ছুটে যেতেন, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে কার্মাটারের অনাহারক্লিষ্ট সাঁওতালদের জন্য কেঁদে ফেলেছেন, আজ পুঁজিবাদ শাসিত ও শোষিত ভারতবর্ষে সেই দারিদ্র্য, অনটন, অনাহার চরম রূপ নিয়েছে। লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষ প্রতি বছর অনাহারে বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারাচ্ছে, ঋণের দায়ে আত্মহত্যা করছে।

নবজাগরণের সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র বিদ্যাসাগরের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন আজ আমাদের কী করতে বলে

দেশের এই চরম দুর্দিনে বিদ্যাসাগরের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন আমাদের কী করতে বলে? তাঁর প্রতিকৃতিতে সুদৃশ্য পুষ্পশোভিত মাল্যদান, সুনির্বাচিত উদ্ধৃতি সংবলিত ভাষণদান — এসব করেই যদি আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করি, আর আপনারাও তারিফ করতে করতে ফিরে গিয়ে প্রতিদিনের জীবনের গড্ডলিকা স্রোতে গা ভাসান, যদি না একবার ভাবার ফুরসৎ পান যে, এই মহান চরিত্র, এই মহৎ সংগ্রাম আমাদের কী করতে বলে, তাহলে বৃথা এই অনুষ্ঠান, বৃথা এই আয়োজন।

এতক্ষণ আপনাদের সাথে যে বিদ্যাসাগরের পরিচিতি ঘটানোর চেষ্টা করলাম, এই বিদ্যাসাগর আমার কাছেও অপরিচিত ছিলেন। আপনারা যেমন স্কুল পাঠ্যপুস্তক থেকে, নানা মুখে শুনে কিছু জানতেন, আমিও তাই জানতাম। আমাকে নতুন করে বিদ্যাসাগরকে জানার প্রেরণা ও চেনার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছেন

বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ। তিনি সেই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র হিসাবে বিদ্যাসাগরকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন এবং আমাদের বারবার বলেছেন, বিদ্যাসাগর সহ সেই যুগের বড় মানুষদের, মনীষীদের ও বিপ্লবী যোদ্ধাদের জীবনসংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে পুঁজিবাদবিরোধী নতুন বিপ্লবী আদর্শ ও চরিত্র সাধনায় আরও এগিয়ে যেতে। এই মন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আজ আমি ভারতীয় নবজাগরণের এই মহান চরিত্র থেকে পুনরায় শেখার সুযোগ পেলাম। সেজন্য উদ্যোক্তাদের ও আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

পুনরায় বলতে চাই, সবদিক বিচার করে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে এদেশের নবজাগরণ ও স্বদেশি আন্দোলন যুগের সর্বাপেক্ষা মহৎ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন বিদ্যাসাগর। এমনকী পাশ্চাত্ত্যের নবজাগরণের অধ্যায়েও তাঁর সাথে তুলনা চলে এমন চরিত্র পাওয়া খুবই কঠিন।

সর্বশেষে বিদ্যাসাগরের সেই উক্তি আবারও আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে, 'এদেশের উদ্ধার হইতে বহু বিলম্ব আছে। পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাত পুরু মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নূতন মানুষের চাষ করিতে পারিলে, তবে এদেশের ভাল হয়।' [১] সর্বাত্মক সঙ্কটে জর্জরিত অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনে আজ এই উক্তির সারবত্তা আরও প্রতিভাত হচ্ছে। আমরা কি এই ঐতিহাসিক উক্তির আবেদনকে বুকে বহন করে এগোতে পারি?

আশা করি, আমার কথাগুলি আপনারা ভেবে দেখবেন।

পরিশিষ্ট

† চিহ্নিত অংশগুলি শ্রীযুক্ত ইন্দ্র মিত্র লিখিত করুণাসাগর বিদ্যাসাগর পুস্তক থেকে উদ্ধৃত।

পৃঃ ৫[১] "The genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman, and the heart of a Bengali mother." (মাইকেল মধুসূদন দত্তের চিঠি।)

পৃঃ ৬ [১] [২] চরিতকথা - রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।
[৩], [৪] বিদ্যাসাগর চরিত - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পৃঃ ৯ [১] শরৎ মূল্যায়ন প্রসঙ্গে - শিবদাস ঘোষ।

পৃঃ ১১ [১] "… mighty epoch which we Germans term Reformation … and which the French term the Renaissance, and the Italians the Cinquecento, … …It is the epoch which had its rise in the latter half of the fifteenth century. Royalty, with the support of the burghers of the towns, broke the power of the feudal nobility and established the great monarchies, based essentially on nationality, within which the modern

European nations and modern bourgeois society came to development." ('প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা'র ভূমিকা — ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস।)

পৃঃ ১১(২) "From the serfs of the Middle Ages sprang the chartered burghers of the earliest towns. From these burghers the elements of the bourgeoisie were developed". (কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো - মার্কস-এঙ্গেলস)

পৃঃ ১৩(১) "The boom at the end of the 19th century and the crisis of 1900-03. Cartels become one of the foundations of the whole of economic life. Capitalism has been transformed into imperialism". (সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর — লেনিন।)

পৃঃ ১৫(১) "The table I write on, I say, exist, i.e., I see and feel it, and if I were out of my study, I should say, it existed..." (Empirio Criticism – Lenin)

পৃঃ ১৬(১),(২),(৩), এফ জি ময়েট-এর কাছে লেখা বিদ্যাসাগরের পত্র - বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ।

পৃঃ ১৭(১) ঐ

পৃঃ ১৯(১) মার্ডকের রিপোর্ট — "...The above two (passages) taken in connection with the passages previously omitted, seems to teach rank Materialism.

It has been asserted that it is "misleading" to characterize such books as "Secularist". The author is described as "the well-known Hindu reformer". But this is no proof to the contrary. His reforms are purely social. So far as the writer is aware, he has kept himself entirely aloof from the Brahmo Somaj movement. Robert Owen, the Secularist, was also a reformer in his way.

The writer described the above books, not simply as prepared by a Secularist, but as Secularist. He did so because the author deliberately struck out the injunction to worship God; because his moral teaching has no reference to God's will, but simply to what people around would think or do; because he omitted all passages teaching the immortality of the soul, the responsibility of man, and the difference between him and the brutes that perish...." †

পৃঃ ২০ (১), বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ।

পৃঃ ২৫(১),(২) বিদ্যাসাগর চরিত - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পৃঃ ২৬, (১), ২৭,(১), ২৮,(১), ২৯, (১), (২) (৩) বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, ২য় খন্ড।

পৃঃ ৩০(১) 'To educate the whole people is certainly desirable'

...."It may be remarked that notwithstanding the high state of civilisation in England, the masses there are no better than their breathren in this country on the point of education".

"... but should it be the contemplation of government to try the experiment it must be prepared for giving education free for all charges."

পৃঃ ৩১(১) "... ... it seems almost impracticable in the present circumstances of the country ... the government should, in my humble

opinion, confine itself to the education... on a comprehensive scale. ... mere reading and writing and a little of arithmetic, should not comprise the whole of this education. Geography, History, Biography, Arithmetic, Geometry, Natural Philosophy, Moral Philosophy, Political Economy and Physiology should be taught to render it complete. ... By educating one boy in a proper style the governemnt does more towards the real education of the people, than by teaching a hundred children mere reading, writing and a little arithmetic."

'I see no objection to the admission of other caste than Brahmans and Baidyas or in other words different order in Sudras to the Sanskrit College. But as a measure of expediency, I would suggest that at present Kayasthas only be admitted".†

পৃঃ ৩২(১) "... if the social prejudice of my countrymen did not offer an insuperable bar I would have been the first to second the proposition".

"I would propose that it should be an offence for a man to consummate marriage before her life has had her first menses ... such a law would not only serve the interests of humanity...".

"I would like the measure to be so framed as to give something like an adequate protection to child-wives without in any way conflicting with any religious usages". †

পৃঃ ৩৫(১) "I have thought it proper to publish this statement solely and wholly in the interest of the cause. I do not care what people may think or say of me individually, but I should be extremely sorry to see anything done which, though originating with the best of motives, was calculated to harm the cause I have espoused. If the parties, who have set subscription on foot, had confined their efforts to that of a Widow Marriage Fund, and had not made allusion to my own liabilities, for meeting which, I need hardly repeat, I had not and have not the remotest idea of appealing to the public, I would not have felt it necessary to remonstrate against the agitation. But so much mixed up with me personally that I must protest against the move under notice, and request those gentlemen who have initiated it to desisting their efforts."†

পৃঃ ৩৮ (১) "According to their social status, the founders of modern socialism, Marx, Engels, themselves belonged to the bourgeois intelligensia."- (Lenin- What is to be done)

পৃঃ ৪৩(১) বিদ্যাসাগর চরিত - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পৃঃ ৪৮(১) বিদ্যাসাগর চরিত - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পৃঃ ৫৪(১) বিদ্যাসাগর রচনা সমগ্র।

‡ চিহ্নিত অংশগুলি বিনয় ঘোষ লিখিত 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ পুস্তক' থেকে উদ্ধৃত।